

ধ্বজ



ডাঃ ডি. ব্রজেন
কল্যাণে
স্বাস্থ্য রক্ষান্ন
সহায়

কম্যাভেশ

ও.আর.প্রি.এল.লিঃ
সাল কি শা • হা ও ডা

স্বাস্থ্যদূরক
তোষ চায় চৌধুরী

দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৬

প্রতি সংখ্যা ১০০ বাবদ পড়করা

বাংলার শিক্ষক সমাজের মুখপত্র।

একাধারে শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক পূর্ব ভারতের অ-
শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রচারিত, শিক্ষক সমাজের মুখপা-
সচিত্র মূলভ মাসিক পত্রিকা

—শিক্ষক—

শ্রাবণে মগৌরবে সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিল
খ্যাতনামা সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ

শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী এম. এ. বি-এল

বার্ষিক মূল্য—৫।০

সম্পাদিত

ষাণ্মাসিক মূল্য

—বৈশিষ্ট্য—

- বিভিন্নমুখী শিক্ষাসমস্যা ও দেশ-বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে খ্যাতনামা শিক্ষাবিদগণ কর্তৃক প্রতি মাসে আলোচনা ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- উচ্চাঙ্গের সাধারণ মাসিকের স্থায় গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ সমৃদ্ধ।
- শিক্ষকসমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অভিযোগ ও দুঃখকষ্ট ইহার স্তম্ভে প্রতিফলিত।
- উপেক্ষিত পল্লীবাসিগণের বাণীপূজার অর্থের জন্ত ইহার একাংশ নিদিষ্ট।
- দেশবিদেশের সংবাদ ও ছোটদের দপ্তর ইহার অন্ততম বিশেষত্ব।

অবিলম্বে গ্রাহক হইয়া জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করুন।

অফিস—৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন দাতাগণ 'শিক্ষকের' মাধ্যমে দূর দূরান্তরে নিজ নিজ পণ্যের বার্তা প্র-

Cuk-H05285-6-P36171

ভারতীয় চা সম্বন্ধ

এভারেস্ট বিজয়ীরা

বালন...

6

During our ascent of Mt. Everest, Indian
tea con...

এভারেস্ট আরোহণে ভারতীয় চা বরাবর
আমাদের শক্তি ও উৎসাহ জুগিয়েছে।
বাঃ যে হাতে
ই. পি. হিলারী
ভেনজিঃ

কলিকাতা—
২৬শে জুন ১৯৫৩

Calcutta

26th June, 1953.

Edmund Hillary E.P. *Hillari*



তেজনিঃ

হিলারী

THE TIMES WORLD COPYRIGHT RESERVED
BY HIMALAYAN COMMITTEE



সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচলিত

শক্তি ও আমনের উৎস

CTN 113

সূচীপত্র—ভাদ্র, ১৩৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	৫৩
শিক্ষা ও সমাজ সমস্যা	
গহজাত সংস্কার—অধ্যাপিকা শ্রীশান্তি দত্ত ও অধ্যাপক শ্রীবিভূষণ গুহ	৫৬
মনের গহনে—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র	৫৮
প্রথম শিক্ষার্থীকে পঠন-শিক্ষা দান— শ্রীচাক্রচন্দ্র চক্রবর্তী	৬২
শিশুর শিক্ষা—শ্রীপ্রমুদকমল মজুমদার	৬৫
গল্প ও কাহিনী	
অস্তি গোদাবরী তীরে— শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৭
মুহূর্ত বিলাস (কবিতা)—শ্রীপ্রভাকর মাথি	৭১
কাব্য-উৎস (কবিতা)—শ্রীনিম লক্ষ্মার চট্টোপাধ্যায়	৭১
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে শিশু—শ্রীশান্তি চক্রবর্তী	৭২
জাপো (কবিতা)—শ্রীবেণু গদ্যোপাধ্যায়	৭৫
তুমি (কবিতা)—শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর	৭৫

দেশ বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

মার্কিন শিক্ষা পদ্ধতিতে উপদেশ ও পরামর্শের
চা বাগানের প্রাথমিক শিক্ষা ও বিবিধ সমস্যা
—সচ্চিদানন্দ

পল্লী গুরুর সাহিত্য সাধনা

দেবতন্ত্র (নক্সা)—শ্রীগোপীকৃষ্ণ মণ্ডল
রবীন্দ্র-প্রয়াণে (কবিতা)—শ্রীস্বধীর কুমার ভৌম
প্রাথমিক শিক্ষক (কবিতা)—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র না
পনেরই আগষ্ট (কবিতা)—শ্রীজিতেন ভৌম

ছোটদের দপ্তর

ইউরোপ-বাহীর পত্র—শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী
মনে নেই চিন্তা (কবিতা)—শ্রীপ্রদীপকুমার চক্র
তকাৎ (কবিতা)—শ্রীরণজিৎ কুমার রায়চৌধুরী

বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা

বাংলার শিক্ষক আন্দোলন

হরিগুণাটী থানা প্রাঃ-শিঃ সংমেলন

অভাব অভিযোগ

শিক্ষা সংবাদ

মাসপঞ্জী

এস-১০০ ('S-100') সলভেন্ট যুক্ত

সুলেখা স্পেশাল

বিদেশী সর্বশ্রেষ্ঠ কালির সমকক্ষ।



সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ

সুলেখা পার্ক, কোন পার্ক ৪২৬৭, কলিঃ ৩২

ষাতি বাতবড় তৈল ত্রাণ

বাড়ের ঘরুনা, স্নায়ুশূল এবং গুপ্তসী
(SCIATICA) ১০ মিনিটে প্রশমিত করে।
প্রফেসর—মিঃ কে, এন, স্নায়ু M.Sc.
F.R.E.S.—“ইহা স্নায়ুশূলে যন্ত্রণা দূর
হইয়াছে। ১ শিশি ১ টাকা।”

বর্ধকের অবলোজিতক মাইষধ

ডলপেটে ও কোমরে তীব্র যন্ত্রণাসহ
কুম্ভাড় অস্পন্দ জাম্প প্রজাপ্রাণ, শিয়ারীড়া, মুহূর্ত
প্রভৃতি উপসর্গ দূর করিয়া প্রয়োৎপাদিকা
শক্তি প্রদান করে।
মিঃ এন, ব্যানার্জি B.L.—“আপনার অবলোজিতক
ব্যবহার করাইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি।”
১ শিশি ১ টাকা ও ৩ শিশি ২ টাকা। ডাক মাষ্টার স্বতন্ত্র

প্রায়সরিষ্ট

১ দাগে হাঁপানির টান দূর করে।

স্নায়ুবাধাদূর কুমার বি, স্নায়ু A.D.C.S.—
“ইহাতে বেশ ফল পাইয়াছি।”
মিঃ এস, কে, সেনগুপ্ত S.P.—“আপনার প্রায়সরিষ্ট
ব্যবহারে শ্বাস-কষ্ট দূর হইয়াছে।”
১ শিশি ১ টাকা ও ৩ শিশি ২ টাকা। ডাক মাষ্টার স্বতন্ত্র

কাদিবাড়ী—শ্রীঅভয়পদ রায় বিদ্যাবিহ কবিরঞ্জন

(আম্বিকেনিয়া ধর্মভবি ভবন)
১৯৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা (দোকান)

শ্রীকু

বিলা

একটি

মহাস্ব

কেশ

মানন

পি, সি

ব

ইহা ম

কে

১ শি

সতা

১২

১২

কবি

এ, সি

১২৭

কলিক

মার

প্তর

ন্যই

লি

যখন ছোটো ছিলাম আমার মা একথাই
তন। সেরা শস্ত থেকে, স্বাস্থ্য-সম্মত
এবং দেড়শো বছরের পেয়াইর
তার সাহায্যে 'পিউরিটি' বালি তৈরি।
বালি যেমন চমৎকার, তেমন এতে
কম।



APBX 8-BEN

পিউরিটি

বালি

আটলান্টিস - (ইন্সট) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা

এখনই ম্যালেরিয়া দূর করুন

নিশ্চিতভাবে - নিরাপদে - নামমাত্র ব্যয়ে

'প্যালুডিন' ম্যালেরিয়ার ঝাম

ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলি জেনে রাখুন :

প্রথমে শীত করে ও জ্বর আসে ; তারপর
ঘাম দেয় ও সর্বাঙ্গে ব্যথা বোধ হয় ।
এইসব লক্ষণ দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে
ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন ।

ম্যা লে রি য়া সা ক্ষা ৭ - ব ম

'প্যালুডিন' সব সময় আছারের পর খাবে
'প্যালুডিন'-এর সঙ্গে প্রাস সুরক্ষি ভল খাবে

পূর্ণবয়স্ক ও ১২ বছরের বড় ছেলেমেয়েদের : এক বড়ি
৬ থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের : আধ বড়ি
৬ বছরের ছোট শিশুদের : সিকি বড়ি

যে পর্বস্তু না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ
এই মাত্রায় খেতে হবে ।



সকলের
সেরা
সিগারেট

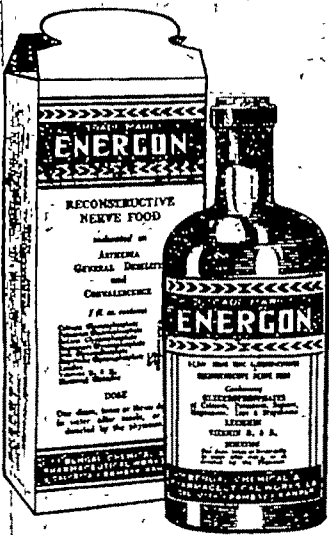


পাঁচ আনায়ে ১০ টি

দু' পয়সায় ১০ টি
এ স্থানীয় করের নিয়মাবলী

S/G/230A

এনার্জন



বেঙ্গল কেমিক্যাল কৃত
টনিক গ্লিসারোকসফেটস

অবসন্ন দেহ ও মনের
পরম রসায়ন

দৈহিক বা মানসিক অবসাদ ও অপটুতা,
অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, মাথাঘোরা প্রভৃতি
উপসর্গে ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ। রোগান্ত
দুর্বলতা, রক্তহীনতা, বেবিবেরি এবং বহুমূত্র
যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়রোগেও ইহা উপকারী।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের কার্যকর্য্যানি সেরা বই

ছবি ও পড়া

(১ম শ্রেণীর)

অধ্যাপক শ্রীমহাতোষ রায় চৌধুরী

অগ্রতিদ্বন্দ্বী অবশ্যপাঠ্য ছবির বই

(বিজ্ঞপ্তি ২২ টি, বি, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫০)

মূল্য—১০/০

সচিত্র শিক্ষা-মঞ্জরী

(২য় শ্রেণীর)

অধ্যাপক শ্রীমহাতোষ রায় চৌধুরী

ছবি ও পড়ার মতই অনিন্দ্যস্মরণ ও অগ্রতিদ্বন্দ্বী

(বিজ্ঞপ্তি ২২ টি, বি, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫০)

মূল্য ৬০

স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সামাজিক শিক্ষা

(৩য় শ্রেণীর জন্ম)

অধ্যাপক শ্রীনির্মল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুমোদিত নূতন বুনিয়াদী সিলেবাস

অনুসারে লিখিত। ১৯

পৃথিবী ও প্রকৃতি

(৪র্থ শ্রেণীর ভূগোলবিজ্ঞান)

অধ্যাপক শ্রীদেবকুমার মিত্র

(২২ টি, বি, ২৯/১১/৫০ এ অনুমোদিত)

৯১ খানি চিত্রে সুসজ্জিত। মূল্য ১১০

পুরাতন ভারত

(৩য় শ্রেণীর ইতিহাস)

নূতন বুনিয়াদী সিলেবাস অনুসারে লিখিত।

অধ্যাপক শ্রীসুনীল কুমার বসু

মূল্য ৬০ আনা।

ভারত পরিচয়

(৪র্থ শ্রেণীর ইতিহাস)

শ্রীমহাতোষ রায় চৌধুরী

অসংখ্য চিত্রযুক্ত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

মূল্য ১৯

আমাদের পরিবেশ

(৩য় শ্রেণীর ভূগোল-বিজ্ঞান)

শ্রীসুকুমার ঘোষ, এম-এস-সি

গল্পের মত সম্পূর্ণ অভিনব পদ্ধতিতে লিখিত

চিন্তাকর্ষক শ্রেষ্ঠ পুস্তক

মূল্য ১৯

পৌরশিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা

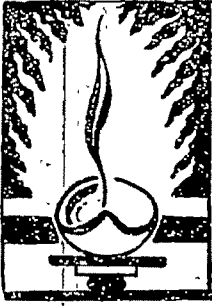
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীশ্রী

(৪র্থ শ্রেণীর জন্ম)

দুর্ভাগ্য বিষয়গুলি সহজ, সুন্দরভাবে লিখিত,

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পুস্তক।

মূল্য ১১০



সিদ্ধান্ত



সম্পাদক—শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক—শ্রীমুনীল রায় চৌধুরী

৭ম বর্ষ]

ভাদ্র, ১৩৬০ P ৩৬১৭১

[২য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত প্রায় সকল সমস্তাই বিশদভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে সিদ্ধান্তের অনেকগুলির মধ্যেই নূতন কিছু নাই। ইতিপূর্বে একাধিক রাজ্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত শিক্ষা কমিশন শিক্ষার ক্রটি-বিচ্যুতি ও সংস্কার সম্বন্ধে অল্পরূপ রিপোর্ট দিয়াছেন। সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টেও মূল সমস্তাগুলির সমাধান বিষয়ে প্রায় একই কথা সংক্ষিপ্ত অথচ অতি সম্প্রতিভাবে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ একই বিষয়ে এই সকল বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদগণের পৃষ্ঠাভূষণ অহুসন্ধান ও সূচিস্তিত অভিমত জ্ঞাপনের পর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নূতন কমিটি বা কমিশন নিয়োগের কোনও প্রয়োজন ছিল বলিয়াই আমাদের মনে হয় না। ব্রিটিশ সরকার কাজ না করিবার অজুহাতের প্রয়োজন হইলেই কমিটি বা কমিশন নিয়োগ করিতেন। আনি না ব্রিটিশ আমলের এই সনাতন নীতি অবলম্বন করিয়া শিক্ষাসচিব মৌলানা আজাদ এই মাধ্যমিক কমিশন নিয়োগ করিয়া-

ছিলেন কি না। কমিশনের রিপোর্টের গতি কি হয় তাহা দেখিয়াই এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যাইবে।

কাজ বনাম কথা

কমিশনের অনেক অভিমতের মধ্যে মৌলিকতা নাই আমরা বলিয়াছি বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা ইহাদের গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, কমিটির অধিকাংশ সুপারিশের সহিতই চিন্তাশীল শিক্ষাবিদগণ একমত হইবেন এবং অবিলম্বে এগুলিকে কার্যকরী করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন। কমিটির সকল অভিমত আলোচনা করিতে গেলে পাঠকের ঐর্ষ্যচ্যুতি ঘটবে। মাত্র দুই-একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের প্রতিই আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। সত্যই যদি সরকার শিক্ষার সংস্কারে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন তবে কথায় অনর্থক আর সময় ক্ষেপণ না করিয়া অবিলম্বে কার্যে প্রবৃত্ত হউন।

শিক্ষকদের অবস্থোন্নতি

কমিশন তাঁহাদের পূর্ববর্তী সহকর্মীদের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া শিক্ষকদের চাকুরির মান ও অবস্থার উন্নয়নের ব্যবস্থা

করিতে বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধীন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের বেতনের হার এক হওয়া এবং একই সঙ্গে সকল শিক্ষককে পেন্সন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও বীমার সুবিধা দেওয়া উচিত। উপযুক্ত লোকদের শিক্ষাক্ষেত্রে আকৃষ্ট করিবার জন্ত ইহা ভিন্ন তাঁহারা আরও কতকগুলি সুখ-সুবিধা দিতেও বলিয়াছেন। শিক্ষকগণের পুত্র-কন্যাদের বিনা ব্যয়ে শিক্ষাদান, বাসগৃহের ব্যবস্থা, রেল ভ্রমণের সুবিধা এবং শিক্ষকদের পরিবারবর্গের চিকিৎসার সাহায্য—এই সকল সুপারিশের মধ্যে প্রধান। গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া আমরাও সরকার ও জনসাধারণকে এই একই কথা বলিয়া আসিতেছি। আমাদের কথা কিন্তু অরণ্যে রোষনেই পর্যবসিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য কমিশনের সুপারিশের ফল কি হয়, জানিবার জন্ত আমরা উৎকণ্ঠিত থাকিব।

আর্থিক সমস্যা

কমিশন সত্যই বলিয়াছেন—শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রধান সমস্যা আর্থনৈতিক। কর্মীর অভাবও যে অল্প সমস্যা তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আর্থসমস্যার সমাধান হইলে কর্মীর অভাব দূরীভূত হইতে যে বেগ পাইতে হইবে না—কমিশনের এই অভিমত আমরা সমর্থন করি। আর্থিক সমস্যা সমাধান করা যে সহজ নহে তাহা সমস্যার বিশালতার কথা মনে করিলেই বুঝা যাইবে। স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা ১১ হইতে ১৭ কিংবা ১৮ বৎসর পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের জন্য চালু করিলেই শুধু হইবে না। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা বহুমুখী এবং দ্রুতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কৃষি, বাণিজ্য ও কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে। ভারত-বর্ষের মত বিরাট দেশের অধিবাসীদের প্রয়োজনানুসরণভাবে এই সকল করিতে হইলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ কোথা হইতে আসিবে?

কমিশনের সমাধান

সংবিধান অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাভার প্রধানতঃ রাজ্যের উপর হস্ত, হইলেও সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও নাগরিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্ত কেন্দ্রীয়

সরকারের দায়িত্ব ও খে-কম, নহে—কমিশন কেন্দ্রীয় গভর্ণ-মেন্টকে তাহা স্পষ্ট ভাষায় স্বরণ করাইয়া দিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। নেহেরু গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ সম্মত আছেন তাহা মনে হয় না। অন্ততঃ মওলানা আবুল কালাম আজাদ একাধিকবার দৃষ্টে করিয়া ঘাটা বলিয়াছেন তাহা হইতে ইহাই মনে হয়। রাজ্য সরকারের রাজস্ববৃদ্ধির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, অর্থ সংগ্রহের যে যে উপায় তাঁহাদের আয়ত্বের মধ্যে তাহার সম্প্রসারণ সহজ নহেই, সম্ভবপর কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ। সুতরাং শিক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারকেই যে কোনও উপায়ে বাহির করিতে হইবে। যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হইলে যে ভাবে অর্থ সংগ্রহ হয়—শিক্ষা ও কৃষিকার বিকল্পে অভিযানের জন্ত ও যে সেইভাবে হওয়া উচিত—ইহা জাতীয় সরকার বুঝিতেছেন না বলিয়াই আমাদের দুঃখ।

অর্থ সংগ্রহের উপায়

কমিশন কতকগুলি উপায়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ সংগ্রহ করিতে বলিয়াছেন। শিল্পের উপর কারিগরী শিক্ষাকর সংস্থাপন এবং শিক্ষার উন্নতি হইলে যে সকল সরকারী বিভাগ উপকৃত হইবে তাহাদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ সংশ্লিষ্ট শিক্ষার জন্ত শিক্ষা তহবিলে প্রদান—ইহাদের মধ্যে প্রধান। কমিশনের এই সুপারিশের বিকল্পে বলিবার কিছুই নাই। কি দেশীয় কি বিদেশীয়, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার জন্ত অর্থদান করাকে তাঁহাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন না। পশ্চিম বাংলায় আমরা দেখিতে পাই—যে শিক্ষাকর মফঃস্বলের প্রত্যেক অধিবাসীকে বহন করিতে হয় তাহা হইতেও এ পর্যন্ত তাঁহারা রেহাই পাইয়া আসিতেছেন। অন্ত্যস্ত প্রশমের অবস্থাও মনে হয় এইরূপ। সুতরাং কমিশনের সুপারিশ অনুসারে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপাধিকৃত অর্থের একটি বিশেষ অংশ যে তাহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষাকর হিসাবে আদায় করা উচিত ইহা অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের জন্ত আমরা উৎসাহের সহিত অপেক্ষা করিব।

বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন ব্যবস্থার গুলনের কথা আমরা বহুদিন বহুবার সরকারের কর্ণগোচর করিয়াছি। বর্তমান ব্যবস্থায় এক একজন অবর পরিদর্শকের উপর প্রায় দেড়শত করিয়া বিদ্যালয় পরিদর্শনের ভার আছে। রবিবার ও অন্ত্যস্ত ছুটির দিন-বাম দিলে প্রায় ২৭০ কি ২৪০ দিনের বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি খোলা থাকে না। অবর পরিদর্শকদের আফিসের কাজ করিতে হয়। মফঃস্বলে যান বাহনের ব্যবস্থা নাই। আবার

যাহা খরচ বাবদ তাঁহারা যাহা পান তাহাতে মকঃখল পরিভ্রমণের প্রয়োজনীয় ব্যয়ও সকল সময় সংকুলান হয় না। ফলে বৎসরে একবারের বেশী কোনও বিদ্যালয়ই পরিদর্শন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। আর এই পরিদর্শনও প্রধানতঃ বিদ্যালয়ের খাতাপত্র প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের অহুসন্ধান ও পরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পরিদর্শকগণ শিক্ষা ও শিক্ষণ বিষয়ক কোনও উপদেশই শিক্ষকগণকে দিতে সময় পান না বলিলে অত্যাঙ্কি হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে যাহা সত্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধেও তাহা। সুতরাং এই অবস্থার পরিদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য যাহা হওয়া উচিত—অর্থাৎ অধ্যাপনা সম্বন্ধে শিক্ষকগণকে হাতে কলমে উপদেশ দান—তাহাই অসিদ্ধ থাকিয়া যায়। শিক্ষণ-শিক্ষা-অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে এতই কম যে বিদ্যালয় পরিদর্শনের এই বর্তমান ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা শিক্ষার উন্নতির পক্ষে একান্ত আবশ্যিক।

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

অত্যন্ত স্থূলের বিষয় শিক্ষা কমিশনও এ বিষয়ে অল্পরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিশনের অহুসন্ধানের বিষয় ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা। সুতরাং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শন ব্যবস্থার কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন। কমিশনের মতে বিদ্যালয় পরিচালনার খুঁটিনাটি বিষয়ের তদন্ত করা যেমন প্রয়োজন শিক্ষকদের সহিত বোগাবোণ স্থাপন করিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের পন্থা নির্দেশ করাও তেমনি বা ততোধিক আবশ্যিক। কমিশন সেই ক্ষুদ্র প্রতি তিন বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া সরকারী পরিদর্শকদের অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের অধ্যাপকদের মধ্য হইতে দুই একজনকে লইয়া বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং পরিদর্শন কালে প্রতিটা বিদ্যালয়ে দুই তিন দিন ধরিয়া থাকিয়া শিক্ষকদের সহিত আলাপ আলোচনা করিবার জন্ত বলিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে কমিশনের সহিত সম্পূর্ণ একমত। কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেলা প্রতি তিন বৎসরে একবারের পরিবর্তে বৎসরে ‘অন্ততঃ একবার করিয়া’ এই প্রকার পরিদর্শন আবশ্যিক বলিয়া আমরা মনে করি।

পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন

পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন-ব্যবস্থা বর্তমানে যে বহু দোষত্রুটি পূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সরকার যে ভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুস্তক নির্বাচন করিয়াছেন তাহার মধ্যে বহু অনাচার ও

স্বৈরাচারের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শিক্ষা-অধিকর্তা এবং ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রীর নিকট একাধিকবার এ বিষয়ে আমরা অভিযোগ করিয়াছি, অন্তান্ত অনেক গ্রন্থকার ও পুস্তক প্রকাশকও অভিযোগ করিয়াছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক পুস্তক নির্বাচনের বিরুদ্ধেও অল্পরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অন্তান্ত প্রবেশের ব্যবস্থাও এইরূপ সমালোচনাব যোগ্য বলিয়াও আমরা শুনিয়াছি। কমিশন এই সকল গলদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির দ্বারা পুস্তক নির্বাচন করাইবার সুপারিশ করিয়াছেন। এই কমিটিতে বিচার বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী—(হাইকোর্টের বিচারপতি হইলেই ভাল হয়) আঞ্চলিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একজন সদস্য, আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জটনৈক অধ্যাপক, রাজ্যের জটনৈক প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষক, দুইজন বিশিষ্ট শিক্ষক এবং শিক্ষা অধিকর্তা স্বয়ং থাকিবেন। সুপারিশের মধ্যে মৌলিকতা আছে সন্দেহ নাই। হাইকোর্টের জজ ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের প্রতি অসীম বিশ্বাসও ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। সুপারিশের বিরুদ্ধে যাহাই বলা যাক্ না কেন—বর্তমান পাঠ্য পুস্তক নির্বাচক কমিটিগুলির অপেক্ষা ইহা যে ভাল হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

শিক্ষামন্ত্রী-সকাশে ‘শিক্ষক’ সম্পাদক

শিক্ষামন্ত্রীর সহিত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকগণের বিভিন্ন দাবী লইয়া কিছুদিন পূর্বে আমাদের যে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল ‘শিক্ষকের’ অন্ততঃ তাহার বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ধৈর্য ও সহ্যভূতির সহিত আমাদের কথা শুনিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের সহিতও এ বিষয়ে আমাদের অতি সক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা হইয়াছে। শীঘ্রই তিনি এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য শুনিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যথাকালেই আমরা আবার তাঁহাকে আমাদের বক্তব্য পেশ করিব। গত বার আমাদের কথা শুনিয়া নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি সকল শ্রেণীর শিক্ষকের জন্তই কিছু না কিছু পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আশা করি এবারও তাহা করিবেন। মাধ্যমিক শিক্ষকগণ অভাবের তাড়নায় চরম পন্থা অবলম্বন করিতে ক্লতসংকল্প হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে একটি আপোষ আলোচনা করা যে নানা দিক্ দিয়া একান্ত প্রয়োজন—একথা আবার আমরা কর্তৃপক্ষকে সতর্কভাবে জানাইতেছি।

শিক্ষা ও সমাজ সমস্যা

সহজাত সংস্কার

অধ্যাপিকা ত্রিশাস্তি দত্ত ও অধ্যাপক ত্রিবিভুরঞ্জন গুহ

সহজাত সংস্কার সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এবার শিক্ষার সাধে এবং সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করবো। পূর্বে ‘শিক্ষা’ বলতে বোঝাতো শুধু বুদ্ধির চর্চা। অর্থাৎ মানবমনের এই বৃত্তিটিকে জীবনের অল্প সমস্ত প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টাই ছিল শিক্ষকের কতব্য। কিন্তু ধীরে ধীরে এ মতের পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষকেরা বুঝতে পেরেছেন মনের বৃত্তিগুলির কতকগুলিকে প্রয়োজনীয় আর কতগুলিকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বৃত্তির বিকাশ সম্ভব নয়—এবং হলেও বাঞ্ছনীয় নয়। জীবনের যে মূল উপাদান তাকে উপেক্ষা করে শিক্ষাটা হাওয়ার উপর দৃষ্টি তৈরীর মত নিষ্ফল। বিশেষ করে ক্রমবিকাশবাদ মনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—এ বোধ যেদিন থেকে এসেচে সেদিন থেকে ‘শুধু’ বুদ্ধি তার কৌলিঙ্গ হারিয়েছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে নিত্যন্ত অপাংক্বেয় সহজাত সংস্কার ও অনুভূতি উত্তরোত্তর মর্যাদা লাভ করেছে। Freudএর যুগান্তকারী আবিষ্কার, যে অবচেতন মনই চেতনমানস ও ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি, শিক্ষার ক্ষেত্রেও মানবের আদিম বৃত্তিগুলির দিকে শিক্ষাবিদেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে অতীতের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার ও অপূর্ণতার একটি প্রধান কারণ শিক্ষার উপায় সম্পর্কে এই ভুল ধারণা। Rousseau বলেছিলেন শিক্ষা দিতে হবে স্বভাব অনুযায়ী। কাজেই মানুষের স্বভাবের বা মূল ভিত্তি তা শিক্ষারও মূল উপাদান। তাইতো শিক্ষকের জানা চাই মানুষের মধ্যে কি instincts আছে, তাদের স্বরূপ কি, কিভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কাজে লাগাতে পারি।

বাল্যকালে মানবশিশু পৃথিবীর অজ্ঞাত ইতর প্রাণীর

শাবকের চেয়ে অনেক বেশী অসহায়—কারণ তার ইঞ্জিয়াদি অপরিণত, তার শক্তি অপরিম্ফুট, তার সহজাত সংস্কার অনেক কম বিকশিত। কিন্তু ইতর প্রাণীর শাবকেরা কতগুলি নির্দিষ্ট এবং সম্পূর্ণ কাঙ্ক্ষকরী সহজাত সংস্কার ও শক্তি নিয়ে জন্মায়। প্রকৃতি তাদের হয়ে লড়াই করে। তাদের পরিবেশ অনেক কম জটিল, তাদের কাছে ‘সমস্যা’ খুব বেশী নেই—তাদের পরিবেশের উপযুক্ত দৈহিক গঠন ও শক্তি দিয়েই প্রকৃতি তাদের পৃথিবীতে পাঠায়। কিন্তু এতে মনে হতে পারে সুবিধাটা বৃষ্টি পশুদেরই। কিন্তু ফলতঃ দেখা যাচ্ছে মানুষ প্রাণী-শ্রেষ্ঠ। তার কারণ তার শক্তিগুলি অপূর্ণ হলেও অসীম সম্ভাবনা পূর্ণ। তার সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলি শিক্ষার অপেক্ষা রাখে এবং বিচার বিবেচনা দ্বারা সে নতুন অবস্থার মধ্যে নতুন পথ তৈরী করে নিতে শেখে।

মানব শিশুর সংস্কারগুলি নমনীয় (Plastic)। শিক্ষকের কতব্য হবে সেই সংস্কারগুলিকে নির্দিষ্ট গতি দেওয়া, সীমাবদ্ধ করা, উন্মোচিত ও উৎসাহিত করা এবং কখনো কখনো প্রয়োজন বোধে রুদ্ধ করা। শিশুর বিচার বুদ্ধি বিকশিত নয়, সুতরাং শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বিচার ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করে জ্ঞান পাওয়ার আশা করা যায় না। শিশু চুরি করেছে। তাকে নীতিকথার উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা বৃথা। কারণ তার নীতিবোধই তখনো জাগ্রিত হয় নি। সেখানে তার ভয়ের সংস্কার লঙ্কার সংস্কারের সাহায্যেই তাকে শাসন করে বৃষ্টিয়ে নিবৃত্ত করতে হবে। শিক্ষককে এটা বুঝতে হবে যে “the young child is behaving on the instinctive level, and that the most powerful motives—one might almost say the only motives—to

which he can successfully appeal are the instincts. It is futile in matters of conduct to appeal to a moral sense that is not there, rather the aid of the instincts of repulsion, escape, self-assertion and submission must be invoked."

শিশুমনের একটি প্রধান সহজাত সংস্কার হচ্ছে কৌতূহল (curiosity)। এ সংস্কার শিক্ষকের একটি প্রধান সহায়। তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ করতে হ'লে প্রথম অবস্থায় এ অহুসঙ্ঘিৎসা প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করে তাকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করে দিতে হবে। হয়তো অনেক প্রশ্ন শিশু করবে যা নিবর্ধক, যা বিরক্তিকর, যা হয়তো বড়দের কাছে মনে হবে অসম্ভাব্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্বাভাবিক শিশুর প্রশ্নের মধ্যে জানবার ইচ্ছাই থাকে। সে স্বাভাবিক বৃত্তিকে অত্যায়াভাবে রুদ্ধ করলে শিশুর বুদ্ধিস্তমকে পছন্দ করে দেওয়া হয়। বাস্তবিক অসঙ্গত, অসঙ্গীল, অসম্ভাব্য প্রশ্ন শিশু করে না—কারণ সে বোধই তার নেই। বড়রাই তাদের অসঙ্গত ইঙ্গিত, এবং অকারণ গোপনতা বা এড়াবার চেষ্টা দিয়ে তাদের মনে অত্যায়া কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। কাজেই অশিক্ষক যিনি, তিনি একদিকে যেমন শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহলকে উৎসাহ দেবেন, তেমনি তিনি সাবধানে লক্ষ্য করবেন যাতে শিশুর কৌতূহল অনভিপ্রেত বিষয়ে লিপ্ত না হয়। তা করবার প্রধান উপায় প্রকৃত স্নেহ ও সহানুভূতি এবং শিক্ষকের নিজ চরিত্রের প্রভাব। কখনো কখনো শিক্ষককে কঠোর হতেও হবে—শিশুকে আনতে দিতে হবে কতগুলি সীমালংঘন লঙ্ঘাতর, শাস্তিযোগ্য, স্তত্রাং অত্যায়া। শিশুর প্রথমে অহুসঙ্ঘিৎসার নির্দিষ্ট একীভূত কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে না। তার প্রথম প্রশ্নগুলি যে কোন দ্রব্য, যে কোন ঘটনা সম্বন্ধে। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে শিশুর প্রশ্নগুলিকে উদ্দেশ্যমুখী করে তোলা—দ্রব্য ও ঘটনা সম্বন্ধে অহুসঙ্ঘিৎসাকে বৈজ্ঞানিক সূত্র বা একতার অহুসঙ্ঘানে পরিণত করা।

শিশুর আর একটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে গড়ে তোলা (constructiveness)। সে বালু দিয়ে পাহাড় গড়ে, নদী, গুহা বানায়, কাঁদা দিয়ে পাখী, মানুষ তৈরী করে। রং-তুলি বা ক্রেট, পেন্সিল পেলে সে স্বাক্ষর ফুল,

মানুষ, ঘোড়া। তার গড়া ঘরবাড়ী, তার স্বাক্ষর ছবি আমাদের বয়স্কদের কাছে মনে হ'তে পারে, উদ্ভট, অসম্ভব, হাস্যকর। কিন্তু শিশুর কাছে সেগুলি অতি সুস্পষ্ট সত্য, নিখুঁত সুন্দর। শিশুর এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি শিক্ষকের আর একটি প্রধান সহায়। শিশুর এই গঠন প্রবৃত্তিকে শিক্ষক উৎসাহিত করে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের সহায়তা করবেন, তাকে সমাজের একজন মূল্যবান কর্মী হিসাবে গড়ে তুলবেন। এখানেও প্রথম অবস্থাতে দেখা যাবে শিশু যা সৃষ্টি করেছে তা খেয়ালী ও উদ্দেশ্যহীন, কিন্তু শিক্ষকের লক্ষ্য হবে শিশুর এই বৃত্তিকে কার্যকরী ও উদ্দেশ্যমুখী করে তোলা, তার গঠনের আবেগকে স্বার্থের ক্ষুদ্রকেন্দ্র থেকে মুক্ত করে সমাজসেবার কাজে লাগানো। নতুন শিকারাবস্থায় তাই হাতের কাজের উপর এত জোর দেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে শিশুর দেহ ও মন দুইই বিকশিত ও সুসম হয়ে উঠতে পারে।

শিশুর আর একটি আনন্দময় সংস্কার খেলা। শিশু খেলতে ভালবাসে—খেলা দেখতে ভালবাসে, খেলার কথা শুনতে ভালবাসে। বড়দের চোখে খেলা হচ্ছে কাজের বিপরীত—কাজ ফাঁকি দেওয়া। তাই প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার অভিভাবক ও শিক্ষক শুধুই বলেন "বীদর ছেলে, সারাদিন কেবল খেলা আর খেলা; আরে মানুষ হতে চাস তো খেলা ছেড়ে পড় আরে পড়। বুধা সময় নষ্ট করিস নি।" এ মূল্যবান উপদেশ যারা দেন তারা ভুলে যান শিশুর কাছে খেলা 'খেলা' নয়—এটাই তার সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজ, সব চেয়ে দরকারী কাজ। এবং এর মধ্য দিয়ে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কর্মচাকলা যেমন সহজ আনন্দে উৎসাহিত হয়; যে কোন শিক্ষক একে উপেক্ষা করে কোন শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুললে তাকে নিতান্ত অন্ধ ও কল্পনা-শক্তিবিহীন বলতে হবে। প্রাচীনরা বড় জোর খেলাকে শিশুর বাহ্যিক শক্তির প্রকাশের পথ বলে মনে করেছেন এবং নিতান্তই যেন অনিচ্ছায়, বড় ভয়ে ভয়ে, বড় সাবধানে 'পড়া' ও 'কাজ' এর ফাঁকে সামান্য কিছু সময় অপচয় করতে রাজী হয়েছেন খেলার ক্ষেত্রে। শিক্ষার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনবার জন্যে খেলাকে তাঁরা স্বীকার করেছেন—কারণ

(শেষাংশ ৫২ পৃষ্ঠার নীচে)

মনের গহনে

[সাধারণ মনোবিজ্ঞান]

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র

মানুষ তার মন নিয়ে এক স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে তোলে। সেখানে সে নিজেই তার অধিপতি; তাকে কেন্দ্র করেই তার কামনা বাসনা পল্লবিত হয়ে ওঠে। আত্মতৃপ্তির মত আনন্দ মানুষের আর কিছুতে নাই; অহংবোধ তৃপ্তি করার জন্য তার কনপ্রচেষ্টার অন্ত নাই। অপরের সংগে তুলনায় নিজের হীনতা দেখা গেলে সেখানে অহংবোধ ক্ষুর হয়, অতিশূন্য হলেও মনের গোপন স্তরে ব্যথার অনুভূতি আপে। আত্মসচেতন মানুষের মন তাই আনন্দ ও ব্যথার রাজ্য।

প্রশংসা

প্রশংসা আত্মসচেতন, বিচারশীল মনের লক্ষণ। এতে মিশ্রিত রয়েছে বিশ্বের আনন্দ, আত্মদীনতার ব্যথা এবং উন্নত মনের উদারতা। কোন ব্যক্তি যখন কোন বিশেষ শক্তির পরিচয় দেয়—এ শক্তি দৈহিক শৌর্য, বা সাহিত্যিক প্রতিভা, বা শিল্পসংস্কৃতি ইত্যাদিতে উৎকর্ষতা, বা সমুপগমের সমাবেশে বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রকাশ—যাই হোক না কেন, তখন মানুষ তা উপলব্ধি করে অন্তরে পুলক অনুভব করে; এরূপ গুণ বা শক্তি তাদের নিজেদের থাকলে তাদের আত্মভিমান তৃপ্ত হত। তাই অন্তরে পুলক সঞ্চল হওয়ার সংগে সংগেই আত্মদীনতাজনিত মনোব্যথাও তার সংগে মিশ্রিত হয়। মানুষের মন যদি উদার হয়, যার যে গুণ আছে তার যোগ্য সমাদর দেখানোর মত মনের সজীবতা যদি থাকে, তবে মানুষ অকৃত্রিম প্রশংসা প্রকাশ করতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, লোকে মনে করে যে অন্তরে প্রশংসা করলে নিজেকে তার চেয়ে হীন বলে প্রকাশে স্বীকার করে নেওয়া হল। তাই লোক-দেখানো প্রশংসা করলেও তার শেষে ‘কিছু’ ‘তবে’ ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে তাকে কিছুটা খাটো করে দিতে পারলে প্রশংসাকারীর মন যেন কিছুটা তৃপ্তিলাভ করে; ভাবখানা ঘেন, এই—এরও

কিছু দোষ আছে। যেমন, উৎকর্ষ-ছন্দ-ভাবা-ভাবসম্বন্ধিত কবিতা পাঠ শুনে প্রশংসাকুল ব্যক্তি বলবেন—‘হ্যাঁ, কবিতা বেশ সুন্দর, তবে আরো ভালো হলে আরো ভালো হত।’ যারা অত্যন্ত দান্তিক, অকৃত্রিম সঙ্ক্ষে বাদের ধারণা খুব উচ্চ, তারা সাধারণতঃ অল্প ব্যক্তির প্রশংসা করতে পারে না; যে গুণের জন্য প্রশংসা করা হবে, তারা মনে করে চেষ্টা করতে ইচ্ছা করলে তারাও তা দেখাতে পারত; মনে মনে তারা আত্মদীনতা সহ্য করতে পারে না। যে ব্যক্তি অপরের যোগ্য গুণের অকৃত্রিম প্রশংসা করতে পারে, বুঝতে হবে তার মন দান্তিকতা থেকে মুক্ত এবং উদারতা ও বিনয় দ্বারা ভূষিত।

আমরা এতক্ষণ যে ধরনের প্রশংসার কথা আলোচনা করছি তা মানুষের মন, যত্নস্ব ও অন্তরের গুণ সঙ্ক্ষে। মানুষের তৈরি জিনিস ছাড়া প্রকৃতির ভিতরকার সুন্দর জিনিসও আমাদের প্রশংসা উদ্রেক করে। সুন্দর গড়নের অগ্নিকুল, লতাগাথা, প্রজাপতির রঙের বাহার আমাদের প্রশংসা অর্জন করে। এখানে এসবের স্রষ্টার শক্তি, কৌশল ও চমৎকারিত্ব মনকে মুগ্ধ করে; যে ভক্তিমিশ্রিত প্রশংসা মনে উদয় হয় তাকে বলি প্রজা।

সম্মান

এর মধ্যে প্রশংসা ও ভয় মিশ্রিত রয়েছে। যখন বিরাট কোন শক্তির প্রকাশ দেখা যায়, মন হয় প্রকুল্লিত, প্রশংসা জেগে ওঠে অন্তরে। এই শক্তির যদি ক্ষয়সকারী ক্ষমতা থাকে তবে ভয়ের উদ্রেক হয় এবং সে মানুষের কাছ থেকে লোকে পেছিয়ে যেতে চায়। বিশ্বয় এবং ভয় একত্রিত হওয়ার মানুষের কাছে যেতে সাহস পায়না কিন্তু দেখার বাসনাও ত্যাগ করতে পারে না; দূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে সে এই বিশ্বয় ও ভয় উপহারনকারী বস্তু নিরীক্ষণ করতে চায়।

প্রবল স্বর্বিষড়, প্রলয়ংকর অধিকাণ্ড, আকাশ ছাওয়া কাণোমেঘে বিহ্যতের ঝিলিক্ মাহুঘের মনে সন্মম জাগিয়ে দেয়। শক্তিশালী, পদস্থ, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকও দর্শকের মনে সন্মমের উদ্রেক করে।

কৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতার মধ্যে আত্মদীনতা, কিছু পরিমাণ প্রীতি এবং বিনয় মেশানো আছে। অকারণে আপনি থেকেই কারো মনে কৃতজ্ঞতা জাগে না, অপরের কোন কাজের উপলব্ধির ফলে মনে এ ভাবের উদয় হয় এবং যিনি সে কাজটি করেছেন তাঁর সম্মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশটি হয় সম্পূর্ণ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তখনই হয় অকৃত্রিম যখন উপকৃত ব্যক্তি বোঝে যে, উপকারী ব্যক্তি যা করেছেন তা তার নিজের পক্ষে করা সাধ্য ছিল না এবং তা তার কল্যাণ সাধন করেছে। উপকার যেখানে অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে পাওয়া যায় সেখানে কৃতজ্ঞতার স্থান কম, কেননা উপকৃত ব্যক্তি আত্মদীনতা বোধ করে না। যে উপকার নিজের শক্তিতে লাভ করা অসাধ্য এবং বার প্রতিদান দেওয়া চলে না তাই বিনয়সম্পন্ন আত্মসচেতন মাহুঘের কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করে।

কৃতজ্ঞতার মধ্যে আত্মদীনতা মিশ্রিত থাকলেও এই

প্রকাশ উপকৃত ব্যক্তির নিকট পীড়াদায়ক নয়, কেননা এর সংগে উপকার জনিত লাভের স্বতিও জড়িত থাকে। কিন্তু উপকারী ব্যক্তি যদি উদারতা, মহামুভবতা ও প্রীতির পরিবর্তে উদ্ধতা এবং অবজ্ঞা প্রদর্শন করে উপকার করে, তবে তা উপকৃত লোকের মন বিকল করে তোলে। কৃতজ্ঞতার স্বাভাবিক প্রকাশ তখন ঘটেনা; আত্মদীনতা ও প্রীতির পরিবর্তে উপকৃত ব্যক্তির মনে রোধের সঞ্চার হয়।

স্বপ্না

এর মধ্যে বিরক্তি ও ক্রোধ দুইটি প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই দুই প্রবৃত্তির প্রকাশে যে বৈশিষ্ট্য আছে, স্বপ্নার প্রকাশে তা স্পষ্ট অমুভব করা যায়। যা বিরক্তি উৎপাদন করে তাকে ঠেলে ছুড়ে ফেলে দেওয়া, তা থেকে দেহকে সংকুচিত করে নেওয়া স্বপ্না প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য—ক্রোধের বৈশিষ্ট্য, যা এ প্রবৃত্তি জাগায় তাকে আঘাত করে চূর্ণ করা। যে ব্যক্তি নিজের আচরণ দ্বারা অপরের স্বপ্না উদ্রেক করে তাকে কাছে আসতে দেখে সে ব্যক্তি খুশী হয় না মোটেই, তাকে সেখান থেকে দূর করে সরিয়ে দিতে পারলে এবং আঘাত করে তার মনের ক্রুদ্ধ ক্রোধ মেটাতে পারলে তার তৃপ্তি হ'ত। স্বপ্নাকারীর আচরণে,

(৫৭:পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নাকি "All work and no play makes Jack a dull boy." কিন্তু ইংলণ্ডে প্রায় দুশো বছর আগে Robert Owen প্রথম এক অভূত কথা বললেন যে ছোট শিশুদের স্বচ্ছন্দ আনন্দ ও চঞ্চলতা রুদ্ধ করে দিয়ে বই-পত্র নিয়ে ক্লাশে বসিয়ে পড়া সম্পূর্ণ নিরর্থক। শিশু শিশুক তার স্বাভাবিক আনন্দের মধ্য দিয়ে। তার পরে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লব আনয়ন করেন Montessori, খেলাকে শিক্ষার কেন্দ্র করে। খেলাটা শিক্ষার পরিপূরক শুধু নয়—খেলাই হওয়া উচিত শিশুশিক্ষার প্রধান ভিত্তি। খেলার মধ্যে শিশুমনের প্রধান ক'টি সংস্কার এসে মিশেছে—এতে আছে আত্মপ্রতিষ্ঠা (self-assertion), সহযোগিতা (gregariousness), প্রতিযোগিতা (pug-

nacity), বাধ্যতা (self-abasement), অমুকরণ (imitation), গঠন (construction), অঙ্গচালন (locomotion); প্রশংসা লাভ ইত্যাদি প্রবৃত্তির বিকাশ। এ বৃত্তিগুলির সম্যক ও সুসম বিকাশেই তো প্রকৃত চরিত্র গঠন। তাই উদারপন্থী আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা খেলার মধ্য দিয়ে শেখা (play way of education)কেই সবচেয়ে-সহজ এবং সবচেয়ে স্থায়ী শিক্ষা বলে মনে ক'ছেন। এ পরীক্ষা কতদূর সার্থক ভবিষ্যৎ কাল এর চূড়ান্ত বিচার করবে, তবে এ পর্যন্ত যে ফল পাওয়া গেছে তাতে আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্রতীদের সন্তুষ্টি হওয়ার কারণ আছে।

শিশুর অল্প সময়ত সহজাত সংস্কারকেও শিক্ষার কাজে লাগান যেতে পারে। বাহ্যিকবোধে সে আলোচনা থেকে বিরত হওয়া পেল।

হাতমুখ নাড়ার ভদ্রীতে ও কণ্ঠধরে বিরক্তি ও ক্রোধের প্রভাব দেখা যায়।

অবজ্ঞা

অবজ্ঞার মধ্যে বিরক্তি ও আত্মপ্রাধিকারের ভাব মিশ্রিত আছে। যুগ্ম ভিত্তির যে ক্রোধের প্রকাশ আছে, অবজ্ঞাতে তা নাই। এখানে আছে তাজ্জিয়া, অর্থাৎ যাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে সে যে অবজ্ঞাকারীর সঙ্গে তুলনায় হীন, নগ্নস্ত্র তা আচরণে প্রকাশ পায়। যে অবজ্ঞা করে সে হয়ত অবজ্ঞাত লোকের সম্বন্ধে বলবে: ওর কথা বাদ দিন, ও একটা অপদার্থ, ওকে তো আমি মাছুষ বলেই গণ্য করি না।

হিংসা

এর মধ্যে আত্মদীনতা ও ক্রোধের মিশ্রণ ঘটেছে। হিংসা আমরা কেবল এমন লোককেই করি যে পদমর্ধ্যদায় এবং অবস্থায় আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তার এই শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের মনে আনে আত্মদীনতার ভাব এবং আমরা বা কামনা করেছিলাম কিন্তু পাইনি অথচ এ লোকটি পেয়েছে—একজ্ঞ মনে জাগে অতি সূক্ষ্ম ক্রোধের কম্পন। যে পদ বা মর্ধ্যদা আমরা কামনা করি নাই তা অত্যন্ত কষ্ট লাভ করলে তেমন হিংসা উঠলে ওঠে না যেমন ওঠে আমাদের কাম্য তিনিস আমাদেরকে বঞ্চিত করে অপরে লাভ করলে। একরূপ ক্ষেত্রে যে কৃতকার্য হয় তার সঙ্গে ব্যক্তিগত রেবারেবি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এমন কি পরিচয় না থাকলেও আমরা মনে মনে তাকে আমাদের বাসনার সার্থকতার পথে প্রবল প্রতিবন্ধক বলে মনে করি। অপরের পদোন্নতি হলে মনের মধ্যে খট করে ওঠে; এই পদোন্নতি যে কেবল তার ব্যক্তিগত গুণের ক্ষুদ্র নয়, এর পিছনে আরো কতগুলি গোপন কারণ আছে, যেমন তদ্বির, 'মামার জোর', অমুকে অমুকে প্রীতি ইত্যাদি—এ সব ইঙ্গিত করে অনেক সময় হিংস্র হৃদে লোক কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেষ্টা করে। তাদের মনের ভাবটা এই রকম—কেবল আসল ব্যক্তিগত গুণের নিরপেক্ষ বিচার হ'লে ও রকম উন্নতি আমাদেরও হতে পারে।

মাছুষের আচরণ ও মনোভাবগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা

যায় অহং বোধ ও আত্মপ্রীতিকে কেন্দ্র করেই তার আপনায় কর্মজগৎ গড়ে উঠেছে। এদের তৃপ্ত করার কামনায়, এদের অবমাননার হাত থেকে বাঁচানার বাসনার মাছুষের চেষ্টার অন্ত নাই। তার প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি আচরণের মূল প্রেরণার সন্ধান করতে হবে মনের গহনে; মনে করতে হবে মাছুষের মনের অন্তঃপুরে রয়েছে এক বিচিত্র রসায়ন-গার, সেখানে বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি ও কামনার সংমিশ্রণ ঘটেছে আর তার কলে যে মানসিক 'পাচন' বা বিচিত্র রস সৃষ্টি হচ্ছে তার রং, কাঁচ, উদ্ভেজনা, তীব্রতা, হর্ষ, ব্যথা, প্রকাশ পাচ্ছে বাইরেরকার আচরণে। মাছুষের মন এক একটি সদা-সক্রিয় কারখানা।

প্রতিহিংসা

এর মধ্যে মিশ্রিত রয়েছে আহত আত্মমর্ধ্যাবোধ ও তীব্র ক্রোধ। আত্মমর্ধ্যাবোধ মাছুষের উন্নত, তাজ্জিয়া মনের পরিচায়ক; অন্তের কাছে প্রশংসা, প্রীতি ও স্নান্য পাওয়ার বাসনা সকল মাছুষেরই আছে। কেউ কারো আত্মসম্মানে আঘাত করলে, অস্ত্রাঘাতাবে লজ্জিত করলে, অপর দশজনের চক্ষে হেয় করলে আহত আত্মাভিমান অস্ত্রাঘাতকারীকে শাস্তি দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে চায়, তীব্র প্রতিহিংসা সাধনে শাস্ত প্রকৃতির মাছুষও তখন নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। মানবসমাজে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা সাধনের নজিরের অভাব নাই। আত্মসম্মানে আঘাতের তীব্রতার কম-বেশী অনুসারে প্রতিহিংসার তীব্রতাও কম-বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু সমগ্রভাবে কোন জাতি যখন প্রতিহিংসা সাধনের উদ্গাদনায় মেতে ওঠে তখন ইতিহাসে সঙ্কট ঘনিষে আসে, দেশে যুদ্ধের সাড়া পড়ে যায়।

আত্মমর্ধ্যদা মাছুষের কাছে প্রিয় এবং আনন্দদায়ক। ইহা যত বেশী ব্যাপক হয় তার আনন্দমহুত্বও হয় তত নিবিড়। এই মর্ধ্যদাবোধ একক মাছুষের গৌণ অতিক্রম করে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে; তাই মাছুষ তার পরিবারের এবং বংশের সম্মান, নিজের সম্মান বলে মনে করে, আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার সমাজের, জাতির এবং দেশের পৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত, অর্গৌরবে নিজেকে

লাঞ্ছিত মনে করে। এক দেশ অথবা কোন দেশে কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলে সে দেশের জনগণ দেশের অপমানকে নিজের অপমান বলে মনে করে এবং এর প্রতিশোধ নেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হতে পারে। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী হিটলারের নেতৃত্বে যুদ্ধের নেশায় যেতে উঠে জাতিগতভাবে প্রতিহিংসা সাধনের উদাহরণ দেখিয়েছে। বহুসংখ্যক লোক যখন লাঞ্ছনা বা অসম্মানের প্রতিশোধ নেবার বাসনায় একত্র সম্মিলিত হয়, তখন তাদের স্বাভাবিক দলপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং প্রতিহিংসাবৃত্তি ক্রমশঃ ধারণ করে। এরূপ কাল তখন দেশবাসীর কাছে স্বদেশপ্রেম বলে গণ্য হয়।

লজ্জা

লজ্জা ও সরম—এ দুইটি কথাই সাধারণতঃ আমরা একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি; এ দুটির মূল উপাদানে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে তা বিচার করে দেখি না। লজ্জা ও সরম, দুটিতেই সংমিশ্রণ ঘটেছে আত্মপ্রাধিক্ত বা আত্মজাহির করার প্রবৃত্তি ও আত্মদীনতা প্রবৃত্তির। দুটি পরস্পর-বিরোধী ভাব একই সঙ্গে মনে জাগরিত থেকে মানুষের আচরণে আনে সঙ্কোচ ও জড়তা। লজ্জার বহিঃপ্রকাশে বৈশিষ্ট্য আছে—লজ্জিত ব্যক্তি অপরের দৃষ্টি এড়াতে চায়; ভিতরের চাপা উত্তেজনায় মুখে রক্ত সঞ্চারিত হয়, ফলে মুখমণ্ডল হয় আরক্তিম, গতি হয় ধীর এবং আড়ষ্ট। সরমের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা, কিছুটা ‘স্বথের মত ব্যাথা’ মেশানো থাকে। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা একটু স্পষ্ট করতে চেষ্টা করি—

আত্মজাহির করার প্রবৃত্তি মানুষের মজ্জাগত; অস্ত্রের কাছে নিজেকে প্রচার ক’বে অপর সকলের কাছে সুখ্যাতি অর্জন ক’রে তার অহমিকা তৃপ্তিলাভ করে। তাবার তার সরম চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে, পদমর্যাদায় প্রতিভার যার স্থান অনেক উচ্চে তার সম্মুখে সে আত্মদীনতা অল্পভন ক’বে মনে মনে সংকুচিত হয়। এরূপ সম্মানিত

ব্যক্তির সঙ্গে যদি তার পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে তবে তার মনে যুগপৎ আত্মদীনতা ও আত্মপ্রাধিক্ত দুইটি ভাবই জেগে ওঠে—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাছে নিজের দীনতার জ্ঞান সংকোচ এবং এরূপ গুণী মানী ব্যক্তির গোচরে আসার সৌভাগ্যহেতু গর্ব ও আনন্দ একই সঙ্গে তার মনে আলোড়ন তোলে। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করতে উঠলেও বক্তার বিশেষ ক’রে নতুন বক্তার মনে আত্মদীনতার ভাব অস্বাচ্ছন্দ্য সঞ্চার ক’রে তার দেহে অতি মৃদু কম্পন জাগায়। এর মধ্যে যে কেবল ভয় ও ব্যথাই রয়েছে তা নয়, আত্মজাহিরের যে সুযোগ সে পেয়েছে তার জ্ঞান সূক্ষ্ম পুঙ্ককের অল্পভূতিও জড়ানো আছে। তাই বক্তা বা অভিনেতা প্রথমবার মঞ্চে উঠে হাতে-পায়ে কিছুটা কাঁপুনি অল্পভব করলেও ভয়ে পালায় না, আত্মজাহিরের নেশায় বরং আরো বেশী সে সুযোগ নেবার কামনা করে। এই ব্যাথা ও আনন্দ মেশানো অল্পভূতির প্রকাশ দেখা দেয় সরমপূর্ণ আচরণের ভিতর দিয়ে।

সরমের মধ্যে আত্মপৌরবেব যে চাপা আনন্দ আছে লজ্জায় তা নেই। আত্মদীনতা প্রবল হয়ে আত্মমর্যাদাকে সাময়িক

লজ্জা ভাবে স্তম্ভ করে দেয়; লজ্জার সঙ্গে অপমান এবং মানসিক বেদনাবোধ জড়িত থাকে। টাকা ধার

নিয়ে শোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও যে ব্যক্তি অভাবের দরুণ ঋণ পবিশোধ করতে পারছে না, পথে হঠাৎ পাওনা-দারের সঙ্গে দেখায় তার মনে আনন্দ হয়না নিশ্চয়ই; কেউ যদি কোন ব্যক্তির পরম উপকারের প্রতিদান দিতে ইচ্ছা ক’রে কেনেস্তনে ঘোরতর অপকার করে উপকারীর, তবে কখনও সে তার মাথা হেঁট না করে পারবে না। আত্ম-সচেতন লোকের নিকট লজ্জা বড়ই অপ্রীতিকর। লজ্জার তীব্রতা বেশী হলে অহমিকাবোধে আঘাত পড়ে, তখন রোষ জলে ওঠে এবং রোষ যদি স্থায়ী হয় তবে সে রোষ পবিশত হয় প্রতিহিংসার বাসনায়।

(শেবাংশ ৬৩ পৃষ্ঠার নীচে)

কাঞ্চন কোলিগের দিনে শুধু আদর্শের কথা বলিয়া ক্ষুধিত শিক্ষককে উপহাস করিও না। জাতির কল্যাণের জন্ত তাঁহাকে উপযুক্ত জীবিকা ও মর্যাদা দাও।

প্রথম শিক্ষার্থীকে পঠন শিক্ষা দান

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রথম শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলিই প্রধান। (ক) বর্ণানুক্রমিক (Alphabetic) (খ) শব্দক্রমিক (Word method) (গ) বৈচিত্র্য পদ্ধতি (Composite method) (ঘ) বাক্যানুক্রমিক (Sentence method) (ঙ) Phonic and Phonetic method (চ) Look and Say method (ছ) Story method.

বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি

বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষভাবে প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে অ, আ, ক, খ, প্রভৃতি বর্ণগুলি সর্বপ্রথমে শিশুদের মুখস্থ করিয়ে পরে তাহার সাহায্যে শব্দ এবং তারপর বাক্য গঠন শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা বাদ দিলেও প্রতি ঘরে ঘরে শিশুকে প্রথমে বর্ণ পরিচয় করানো হয় এবং তারপর তাকে বাক্যগঠনের পদ্ধতি শেখান হয়। এই পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া এবং এভাবে শিশুর পক্ষে জ্ঞান লাভ করা যে কিছুটা কঠিন ও পরিচয় সাপেক্ষ, সে সন্দেহ আমাদের সবারই অভিজ্ঞতা আছে। শিশু তার প্রথম জীবনে—জীবনের প্রারম্ভে ঠিক এই ধরনের মেহনৎ করতে প্রায়ই রাজী থাকে না। তাই পড়াশুনার দিকে তার বীতরাগ এসে পড়া অসম্ভব নয়। শিশুর এই বীতরাগের প্রধান কারণ হল সে সারাদিন যা দেখে, করে, বা বলে তার সাথে সে যা পড়তে অস্বস্তি তার কোন মিল নেই। শিশু দেখছে যে তার দাদা দিদি বা বাবা মা—অ, আ, ক, খ, পড়ছেন না—বা তাদের কথার ভেতরে ঐ অক্ষরগুলো উচ্চারিত হচ্ছে না। সেইজন্য পড়ার নাম করলে তার দেহমন বিজ্ঞোহ করতে চায়, এবং বিদ্যালয় তার কাছে এক ভয়াবহ জিনিষ হয়ে ওঠে। বর্ণ পরিচয়-সমূহ পাড়ি দিয়ে শিশু যখন শব্দ পড়তে শেখে—তখন এক ভীতিগ্রস্ত অবস্থার সে সম্মুখীন হয়। কারণ অজ, আম, অচল, ইত্য

শব্দগুলো সহজ হলেও শিশুর নিকট এগুলি একেবারে অপরিচিত এবং তার আবেষ্টনীর মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে এগুলির ব্যবহার প্রায়শঃ হয় না। এগুলির আবেষ্টনী ভেদ করে শিশু যখন বিত্তীয় ভাগের কঠিন শব্দগুলি শেখা আরম্ভ করে, তখন তার অবস্থা হয় “ছেড়ে দে মা, কেন্দে বাঁচি।” বিদ্যালয় ও শিক্ষক তার নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় বলে মনে হয়—জোর করে শব্দগুলি গলাধঃকরণের চেষ্টা পরবর্তী জীবনে যে সার্থক হয় না আদৌ, তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের চোপের সামনে রয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে যে মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে এই পদ্ধতি অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ।

শব্দ ক্রমিক

এই পদ্ধতি অল্পসারে শিশুদের জানা শব্দগুলি বোর্ডে লিখে দেওয়া হয় এবং বতটা সম্ভব ঐগুলোর ছবি দেখান হয়। তারপরে সেই শব্দগুলি ভেঙ্গে বর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রণালী দ্বারা শিশুদিককে শিক্ষা দিতে বহু সময়ের প্রয়োজন বলে—এই পদ্ধতি কোন দেশে বিশেষ প্রচলিত হয় নাই।

বৈচিত্র্য পদ্ধতি

এই পদ্ধতি অল্পসারে একই রকম দেখতে শব্দগুলো এক একটি বিভাগে সাজান হয়। যেমন—ব, ব, ক, খ, ঝ কিংবা অ, আ, ত, ড ইত্যাদি। প্রথমতঃ এক একটি বিভাগের বর্ণগুলো শিশুদের শেখান হয়, তারপর সেই বর্ণগুলি দিয়ে শব্দগঠন করা হয়—যেমন বক, ধর, কর, রব ইত্যাদি। এইভাবে বাক্যগুলি শব্দ প্রস্তুত করা সম্ভব ততগুলো প্রস্তুত করে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এরপর আর একটি বিভাগ লওয়া হয় এবং সেই বিভাগের বর্ণগুলো শিক্ষা দেওয়া হয়ে গেলে পরে শব্দ এবং তারপর বাক্য গঠন প্রণালী শেখান হয়। এইভাবে সবগুলো বর্ণশিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি অল্পসারে দেখা গেছে

শিশুদের পক্ষে এই রীতি অত্যাশঙ্কন করে সমস্ত বর্ণশিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ বড়দের পরিপ্রেক্ষিতে বরকষ ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্যটা অতি সহজেই নজরে পড়ে কিন্তু শিশুদের পক্ষে এগুলির পার্থক্যটা বুঝে ওঠা অত্যন্ত কঠিন।

Phonic and Phonetic method—

এই পদ্ধতি স্কটল্যান্ডে প্রচলিত। ইহাতে প্রত্যেক অক্ষরের জন্য এক একটি বিভিন্ন ধরনের শব্দের সৃষ্টি করা হয়। Phonic-এর জন্য ২৪টি শব্দ আর Phonetic-এর জন্য ৪০টি শব্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের ব্যক্তিদের বিভিন্ন মত আছে। দেখা গেছে এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে প্রসার লাভ করতে পারে নাই। শিশুদের কাছে শব্দের মধ্য দিয়ে শেখানোর চাইতে চাক্ষুষ শিক্ষা লাভ করাটাই সোজা—তাই এই পদ্ধতি বিশেষ প্রসার লাভ করতে পারে নাই।

Look & Say method

এই পদ্ধতির গ্রহণন আমি খানিকটা লম্বাটো ফুলে দেখেছিলাম। এতে ছবির সাহায্য গ্রহণ করা হয়; যেমন ছবির একদিকে বাবা মা আর একদিকে বাড়ীর সমস্ত পরিজনকে দেখান হয়েছে। এই সব ছবি দেখে শিশু যেসব কথা বলে—সেই সব তাদের শেখান হয়। এইভাবে বিভিন্ন ধরনের ছবি ব্যবহার করে শিশুদের বর্ণ, শব্দ এবং পরে বাক্য শেখান হয়। এই পদ্ধতিকে পুরোপুরি ব্যবহার করে অক্ষর পরিচয় করান সম্ভব হয়নি, এর সঙ্গে আরও অত্যাশঙ্ক প্রণালীও ব্যবহার করতে হয়।

Story method

গল্পছলে শব্দসম্ভার বৃদ্ধি করে পরে উহা থেকে শব্দ বেছে নিয়ে শিশুদের শব্দ ও বাক্য শেখান হয়। এই পদ্ধতি বহুল প্রচলিত নয়।

বাক্যাত্মক (বা Sentence method)

প্রণালী—

আমাদের দেশে এই পদ্ধতি নতুন; কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার এই পদ্ধতি অনেক দিন থেকেই চলে আসছে। ডাঃ ডিক্রোলী সর্বপ্রথম এই পদ্ধতিটি কাজে লাগান। বর্ণাত্মক ও দ্বৈত পদ্ধতিতে আমরা দেখেছি যে শিশুর সমগ্র মনোযোগ থাকে প্রতিটি শব্দ ও বর্ণ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারল কিনা সেইদিকে। বাক্যটির মধ্যে কি বলা হয় তার সম্বন্ধে কোন উৎসাহ বা চিন্তা শিশুর থাকে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে ও সৃষ্ট পঠনের সঙ্গে চক্ষুচালনা করিবার শক্তি বেড়ে যায়। এই পদ্ধতি অত্যন্ত মনোবিজ্ঞান সম্মত। মানুষ বা কিছু করে বা ভাবে তার পেছনে থেকে সম্পূর্ণ একটা বাক্য। কারণ কোন একটা অক্ষর বা শব্দের দ্বারা মানুষের চিন্তার সম্পূর্ণতা আসে না। শিশুর মনোবৃত্তির দিক দিয়ে এই কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে একথা অতি সত্য কথা। তাই তার পঠন পদ্ধতি যদি বাক্য দ্বারা আয়ত্ত হয় তবে তাহা তার পক্ষে সহজাত হবে এবং অতি সহজেই বুঝতে পারবে।

বাক্যকে Unit ধরে শিক্ষা দেওয়ার ফলে নিম্নলিখিত উপকারিতা আমরা লক্ষ্য করি।

(৬১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অনুতাপ

এর মধ্যে মেশানো আছে মনোব্যথা ও ক্রোধ; এ ক্রোধ অন্তের উপর নয়, নিজের উপর। মানুষ যখন নিজের এমন কোন কাজ করে বসে—যার ফলে নিজের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় কিংবা নিজের কোন গুরুতর ক্ষতি ঘটে, যা পূরণ করা সম্ভব নয়—তখন তার বিচারশীল মন নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করে। আর সে অন্তর অস্ত্র কেউ করলে তার প্রতি রোষ, প্রতিহিংসা জ্বলে উঠত এবং তাকে শান্তি দিতে পারলে ক্ষুণ্ণ মন হয়ত কিছুটা শান্ত হ'ত—কিন্তু নিজেকে

যেখানে অপরাধী, সেখানে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সুযোগ থাকে না। অনুতাপ বাণের মত মনকে বিদ্ধ করতে থাকে, তুষের আগুনের মত বিকিরিত জ্বলে অন্তর দগ্ধ করে। অনুশোচনার প্রবল আবেগে অনেক সময় মানুষ নিজের মাথায় নিজেকে আঘাত করে; প্রায়শ্চিত্ত মানসে উপবাস করে দেহকে শাস্তি দিয়ে মনের ব্যথা দূর করার চেষ্টা করে; অনুতাপ নির্দারক এবং অসহ্য হলে মানুষ আত্ম-হত্যা করে সব জ্বালায় হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে।

(ক) একটা সম্পূর্ণ, কিছুকে চিন্তা করা শিশুর পক্ষে সহজ নয়।

(খ) চিন্তার মধ্যে শৃঙ্খলা থাকে।

(গ) প্রকাশভঙ্গী বেড়ে যায়, এবং একই সঙ্গে অর্থবোধ বাড়ে, পড়ার গতি দ্রুত হয় এবং চক্ষু চালনা ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এই নিয়ম অনুসরণ করতে গেলে প্রথমতঃ কি কি নিয়ম শিক্ষকের পক্ষে পালন করা কঠিন তা আমাদের জানা দরকার।

(১) শিশুকে প্রথমে তার অতি পরিচিত বাক্য দ্বারা পাঠ আরম্ভ করতে হবে।

(২) বাক্যগুলির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকবে।

(৩) ধীরে ধীরে ও অল্প অল্প করে নতুন শব্দ প্রবেশ করাতে হবে।

(৪) নতুন শব্দগুলো অন্ততঃ চার পাঁচবার উল্লেখ করে তা শিশুর মনে গেঁথে দিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে বানান শিক্ষা করবার প্রকৃষ্ট উপায় হ'ল চোখের দ্বারা পরিষ্কার করে দেখা—এবং মনে রাখা। এই পদ্ধতিতে প্রথম থেকে একই শব্দকে বাক্যের মধ্যে বহুবার দেখার ফলে শিশুর পক্ষ থেকে বানান শিক্ষা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।

তাই এই পদ্ধতি যে একেবারে মনোবিজ্ঞানসম্মত সে সম্বন্ধে কান্নুর সন্দেহ নেই।

বাক্য ক্রমিক পদ্ধতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মনীষিগণের মত উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ডিক্রোলি বলেছেন “মায়ের কাছে শিশু যখন প্রথম কথা বলতে শেখে তখন সে যে পদ্ধতিতে শেখে সে যখন পড়তে শিখবে তখনও সেই নিয়ম পালন করা উচিত। শিশু প্রথম জীবনে মা বাপের কাছে বা তার পারিপার্শ্বিকের কাছে যে সমস্ত বাক্য শিখবে সেইগুলোর পঠন সম্বন্ধেও শিশুর সহজাত একটা প্রবৃত্তি থাকে। তাই দীর্ঘদিন ধরে যে বাক্য বহুবার সে শ্রবণ করে, তা পঠনের দিক থেকেও শিশুর নিকট সহজ হয়ে আসে।” তাঁহার মতে “যতই শিশু পঠন কার্যে অগ্রসর হ'য়ে যাবে, ততই ক্রমে আবৃত্তির প্রয়োজন কমে আসবে। প্রথম জীবনে শিশু বইয়ের লেখার সাথে তার চিন্তাধারার একটা সঙ্গতি খুঁজে পায়, তাই পঠন কার্য শিখতে তার মোটেই কষ্ট হয় না বরং পাঠে দ্রুতই সে অগ্রসর হয়। সধা সর্বদা সে যাহা দেখে যাহা জানে এবং যাহা চিন্তা করতে পারে—এমন কল্পনাপূর্ণ পাঠ দিতে হ'বে। বাক্যগুলিকে শব্দ বা বর্ণে পড়ান একেবারে নিষিদ্ধ।”

এই প্রণালী অনুসারে শেখাতে হলে প্রত্যেকটি বাক্য

আলাদা ক'রে, কার্ডে বড় বড় ক'রে লিখে আনতে হবে। একটি বাক্যের অন্ততঃপক্ষে ৪৫টি কার্ড থাকবে। তাছাড়া ঐ বাক্যটিরই বিভিন্ন শব্দগুলি আলাদা ক'রে কেটে রাখতে হবে। প্রথম সাত, আটটি পাঠে বধাসম্ভব প্রতি বাক্যের একটি কার্ডে একটি ক'রে ছবি থাকলে ভাল হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি বাক্যের ছবিবিহীন কার্ডও থাকবে। বাক্যগুলি শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিশুদের দেখাবেন। বাক্যের অর্থবোধক ছবি দেখাবেন এবং বাক্যটিকে পূর্ণভাবে উচ্চারণ করবেন। শিশুরা শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে অনুসরণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটিকে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবে। কিছুক্ষণ এইরকম করবার পরে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী বাক্যগুলিকে দিয়ে নানারূপ খেলা দেবেন। যেমন অনেকগুলি বাক্যের কার্ড ও শব্দের কার্ডের মধ্য থেকে একটি বিশেষ বাক্যের কার্ড চিনে বের করা, ছবির সঙ্গে বাক্য মেলান, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরী করা ইত্যাদি নানারকম খেলা হতে পারে।

মিস্ লাডফোর্ড বলেন—“ছন্দোবদ্ধ বাক্যই শিশুকে পড়া শেখাবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। তিনি আরও বলেন যে বর্ণ শিশুরা নিজেরাই শিখবে।”

ডাঃ জেগার তাঁর “The Sentence method of teaching reading” বইয়ে এই বাক্যক্রমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে শিশুর পক্ষে বাক্য দ্বারা পঠন শিক্ষাই উৎকৃষ্ট পন্থা। তিনি আরও বলেছেন যে বর্ণ বিশ্লেষণ শিশুর পক্ষে কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়, ক্ষতিকরও বটে।

Eidlith Luke ও বাক্যক্রমিক পদ্ধতিকে মেনে নিয়ে কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছেন।

1. To read silently before attempting to read aloud.

2. To avoid pointing to words while reading.

3. To avoid head movements.

4. To read silently without any audible expression and to begin to eliminate lip.

5. To use all correct eye-movement, ইত্যাদি।

আমাদের দেশে এই পদ্ধতি নতুন হলেও ইতোমধ্যেই অনেক বিদ্যালয়ে এই প্রণালীতে শিক্ষাদান আরম্ভ হ'য়েছে। সকলেই ইচ্ছা করলে এই বাক্যক্রমিক পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করতে পারেন।

শিশুর শিক্ষা

শ্রীপ্রফুল্লকমল মজুমদার :

প্রতিটি শিশু স্বতন্ত্র। বাইরের চেহারা দেখে যেমন আমরা শিশুদের পার্থক্য নির্ধারণ করিতে পারি তদ্রূপ যে কোন শিশুর প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি—এক অপরের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক।

মনস্তত্ত্ববিদগণ এর কারণ বলেন (১) বুদ্ধির পার্থক্য, (২) বিষয় বিশেষে আসক্তি বা অনাসক্তি, (৩) স্বাস্থ্য (৪) স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতা। ও (৫) পারিপার্শ্বিক অবস্থা। প্রথমতঃ বুদ্ধিবৃত্তির কথা বিচার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই কারো বুদ্ধি স্বাভাবিক, কারো স্বাভাবিক শিশু অপেক্ষা কম আবার কেহ একেবারে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। অপর দিকে কেহ স্বাভাবিক শিশু অপেক্ষা বুদ্ধিমান, কেহ মেধাবী বা অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন। একটি আট বৎসরের ছেলে যদি ২০ পৃষ্ঠান্ত গুণিতে না পারে, ডান বা চিমুতে না পারে, একটি গল্পের ছবিতে লেজ আঁকা না থাকিলে কোন জিনিষটী নাই তা'বলিতে না পারে তবে তাকে সাধারণ শিশুর পৰ্য্যায়ে আনা চলে না। আবার আর একটি ঐ বয়সের ছেলে যদি ১০ বৎসরের ছেলের জ্ঞান নির্দিষ্ট বুদ্ধিমানের পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় তবে তাকে ও পূর্বোক্ত শিশুটিকে সাধারণ শিশুর সাথে রেখে কাজ চালান যেতে পারে না। প্রথমোক্ত ছেলেটি শ্রেণীতে থেকে কোন উপকার পাবে না। অপরটির ছেলেরা তাকে পেছনে ফেলে চলে যাবে। শ্রেণীর সঙ্গে চলার অসামর্থ্যে সে নিজের উপর বীভৎস হইয়া উঠবে। ব্যক্তিগত সাহায্য দিয়ে তার সকলপ্রকার অসুবিধা দূর ক'রে কিংবা তার আভ্যন্তরীণ বিশেষ কোন শক্তিকে আবিষ্কার ক'রে যথাসমুদায় শিক্ষা দিলে সে—ও সমাজের প্রয়োজনীয় নাগরিকরূপে পরিণত হ'তে পারে। পক্ষান্তরে মেধাবী ছেলে শ্রেণীতে নিজস্বমতের পরিপোষক অসুবিধা শিক্ষা পাবে না। সে অল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু শিখে অসত্যতার আশ্রয় নেবে অথবা দ্রুতপন্য শিখবে। তাহলে বুঝা যায় বুদ্ধির তারতম্য

অনুসারে বিভিন্ন ছেলের বিভিন্ন বিষয়ে সমান পারগতা থাকে না। কাজেই আমাদের অরণ রাধুতে হবে সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কিছুতেই সাকল্য লাভ আশা করা যায় না। বাগানের মালী যেমন প্রতিটি চারাগাছের স্বত্ব নেয়, তাতে সার দেয়, জল দেয়, আগাছা পরিষ্কার করে, বেড়া দিয়ে গুলু ছাগলের উৎপাত থেকে রক্ষা করে সেরূপ প্রতিটি বালকের প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা দূর ক'রে তার অন্তরকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা শিক্ষকের কর্তব্য। একটি লেংড়া আমগাছকে যেমন শত চেষ্টায়ও ফললী আমগাছে পরিণত করা যায় না তদ্রূপ প্রতিটি শিশুকে কালো মাটি দিয়ে ছাঁচে গড়া পুতুলের মত এক ছাঁচে গড়তে চেষ্টা করিলে শিক্ষক ব্যর্থ মনোরথ হবেন সন্দেহ নাই। কারণ প্রতিটি শিশু আপন শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠবে।

দ্বিতী শিশু সন্ধান বুদ্ধিমান হ'লেই যে তারা সকল বিষয়ে সমান পারদর্শিতা দেখাতে পারবে তাও নয়। একই মানসিক বয়সের ছেলেদের দলের একটি ছেলে সাহিত্যে উৎকৃষ্ট হ'লেও অঙ্কে বা অপর কোনও বিষয়ে তাকে অপরের নীচে প'ড়ে থাকতে দেখা যায়। সে হয়ত ৪৫টি সংখ্যা অরণ রাধুতে পারে না কিন্তু হৃদীর্ঘ কবিতা অনর্গল মুখস্ত বলে যেতে পারে। আবার দেখা যায় কোন ছেলে লেখাপড়ায় খুব ভাল না হলেও কলা ও শিল্পে সে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারে। এর কারণ বলা যেতে পারে বিষয় বিশেষের প্রতি আসক্তি বা অনাসক্তি। প্রখ্যাতনামা জর্জনক প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কথা শুনেছি যে বিভাগীয় সংক্রান্ত সকল খুঁটিনাটি তাঁর নখদর্পণে কিন্তু পত্রীর পত্রখানা ডাকে ফেলতে দিলে রোজই ভুলে যান আর বাড়ী এসে বসুনি খান। সেরূপ শিশুর ও তার খেলার কথা, পুতুলের কথা, গল্পের কথা সব মনে থাকে কিন্তু পড়ার বিষয় হ'লেই

যত সব গুণগোল এসে উপস্থিত হয়। তার চোখের সম্মুখে নিয়ত নানা দৃশ্য ঘুরে বেড়ায় কিন্তু অল্পরূপ সম্পূর্ণ না হ'লে উহা তার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে না।

সব শিশুর মানসিক ভাবপ্রবণতা এক নয়। একই শিশুর ও সব সময়ে একরূপ ভাব প্রতিক্রিয়া বা কর্মস্পৃহা থাকে না। সমানবুদ্ধিসম্পন্ন দুটি শিশুর স্বাস্থ্যের তারতম্যেও তাদের পার্থক্যের বিরূপে ব্যাখ্যা করা যায়।

শিশুশিক্ষায় পারিপার্শ্বিক প্রভাব মস্ত বড়। উন্নত পরিবেশের একটি শিশু স্বভাবতঃই অল্পমত পরিবেশের আর একটি শিশু অপেক্ষা অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা পায়। শিক্ষিত পরিবারের একটি শিশুর শব্দ সম্পদ নিরক্ষর পরিবারের ওরই মত বুদ্ধিমান অপর শিশুর চাইতে অনেক বেশী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কলে প্রথম শিশুটি দ্বিতীয় শিশু অপেক্ষা ভাষা শিক্ষায় অগ্রগামী হবে সন্দেহ নাই।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সকল শিশুকে সমান ক'রে গ'ড়ে তোলার চেষ্টা নিরর্থক। বুদ্ধি, রুচি, প্রকৃতি ও শক্তি অল্পস্বাভাবিক ভিন্ন ভিন্ন শিশুকে বিভিন্নরূপে ব্যক্তিগত সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এর ব্যক্তিগত শিক্ষার রূপ কি হবে? প্রতিটি শিশুর জন্য তো একজন করে শিক্ষক নিয়োগ করা চলে না। তা ছাড়া শিশু সামাজিক জীব। সমাজের অপরাধের শিশুর সাথে মিলেমিশে থাকতে প্রথমাবধি না শিখলে তার সামাজিক গুণগুলির বিকাশ হতে পারে না। তাহলে এমন উপায় উদ্ভাবন করতে হবে, যার মাধ্যমে শিশু আপন ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের একজন উপযুক্ত নাগরিকরূপে পরিগণিত হবে। এ সমস্ত বিবেচনা ক'রে এবং শিশুমনস্তত্ত্বের উপর লক্ষ্য রেখে বর্তমান সারা শিক্ষাজগতে কর্মক্ষেত্রিক শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা চলছে। এর মূল স্বত্র হচ্ছে শিশু আত্মচেতনায়, কর্ম-মাধ্যমে স্বীয় শক্তি অল্পব্যয়ী শিক্ষালাভ করবে। কতক কাজ করবে সে ব্যক্তিগতভাবে আর

কতক করবে দলগতভাবে। ব্যক্তিগত কর্মের মধ্য দিয়া সে আপন ব্যক্তিত্বের বিকাশ করবে এবং দলগত কাজের ভেতর দিয়ে সে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাথে সাথে সামাজিক শিক্ষা লাভ করবে।

প্রতিটি কর্ম হবে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত ও তার স্বষ্টিধর্মী মনের পরিপোষক, এতে অনাবশ্যক বিধিনিষেধ থাকবে না। শিক্ষক থাকবেন পরোক্ষ—যেন দর্শকের ভূমিকায়। তিনি কৌশলী এবং কৌশলে শিশুকে স্বতঃপ্রণোদিত কর্মে উৎসাহ করে অদৃশ্য হস্তের নিয়ন্ত্রণে ভবিষ্যৎ শিক্ষার পথে এগিয়ে দেবেন। শিশু চায় খেলা এবং কাজ—আর সে চায় বড়দের অনুকরণ করতে ও আপন পরিবেশকে বৃত্তিতে। শিক্ষককে নিতে হবে এ সব বৃত্তির সুযোগ। তাঁকে স্বরণ রাখতে হবে, খেলা যেন নিছক খেলায় পর্য্যবসিত না হয়, আর কর্ম যেন শুধু কর্মের জন্য না হয়। তার শিশুসুলভ খেলা ও কাজ যেন তাকে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে পরিপূর্ণ মাতুষ্য হবার পথে টেনে নিয়ে যায়।

কর্মের মাধ্যমে শিশুর দৈহিক উন্নতি বিধান হবে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে, আত্মপ্রকাশের সুযোগ আসবে এবং তার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে। প্রত্যেকটি জিনিষ সে নিজে দেখে শুনে ও পরখ করে, তার 'কেন' ও 'কি' সম্বন্ধ করে আপন কৌতুহলবৃত্তি চরিতার্থ করবে। কাজ করতে করতে শিশুর সম্মুখে এমন কতকগুলি সমস্তার উদ্ভব হবে—যেগুলির সমাধানের জন্য তাকে ধীরে ধীরে সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল-ইত্যাদির দিকে অগ্রসর হতে হবে। খেলাধুলা, নাচ-গান, অভিনয়, সভা-সমিতি এবং উৎসবপালনের সুযোগে সে নানাবিধ সামাজিক শিক্ষালাভ করবে। তাহলে দেখা যায়, কর্মক্ষেত্রিক শিক্ষা পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনযাত্রার এক সুন্দর সংযোগ স্থাপন করে। মোট কথা—আত্মচেতনাপ্রসূত কর্মক্ষেত্রিক শিক্ষায় শিশু শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনের যে সুযোগ পায়, প্রচলিত পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষায় তা সম্ভব হয় না।

যোগ্য অর্থ ও সম্মান দিয়া বৃত্তক্ষু শিক্ষককে কর্তব্যে উৎসাহ কর।



অস্তি গোদাবরী তীরে

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

একটা দুর্জয় অভিমানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে এই মেয়ে, উকাপিণ্ডের মতো কঙ্কচূত হয়ে নেমে এসেছে প্রাণশক্তির এক অপূর্ণ বহিকণা। ঠিক ওর মায়ের মতন। সেই অদম্য প্রাণশক্তি, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। শিশু হয়ে এই রকম মায়ের কোলেই এসে বেন সে জন্মায় যুগে যুগে।

হয়ত ওর দৃষ্টিতে মুখ আরতিই দীপ্তিমান হয়ে ওঠে,—নাগমণি অপাঙ্গে ওর চোখে একবার তাকিয়েই চোখ নাখায়; মনে মনে কী ভাবে কে জানে? মুখখানা রাত্তি হয়ে ওঠে।

এতক্ষণ কেমন বেন অনামনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল লহমী, হঠাৎ বেন চমক ভেঙ্গে জেগে ওঠে, বলে—আমি—যাই পণ্ডিত, কোত্তারা এসেছে, আমায় এখনি খুঁজবে।

বলেই আর দাঁড়ায় না, ক্ষিপ্ত গতিতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। কোত্তার কলরব এরা না শুনেও লহমীর কাণে বেন সুবলীক্ষণের মতো প্রবেশ করেছে; সব কিছু বিস্মরণ হয়ে যায়,—ছুটে যায় বিহ্বল। পাগলিনীর মতো। ব্যাপারটা ঘটে যায় এত আকস্মিক যে সোমনাথ কোন কথা বলার অবসর পায় না, নাগমণিও যে ছুটে চট্—করে ওর দিচ্ছ ধরবে, তা-ও মুহূর্তে মনস্থির করতে পারে না; সোমনাথের কাছে একাকী দাঁড়িয়ে থাকে হয়ত বা লজ্জায়, সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে। নীরবে কেটে যায় কিছুটা সময়।

সোমনাথই নীরবতা ভঙ্গ করে প্রথম, বলে—নাগমণি, তুই কী এদের মধ্যেই থাকবি?

হয়ত এতক্ষণে সংকোচটা একটু কেটে গেছে, হয়ত এতক্ষণে ওর কাছে সহজ হয়ে এসেছে সোমনাথের উপস্থিতি,—ওর প্রশ্নের উত্তরে মুখ তুলে তাকায়,—হয়ত সোমনাথের এই অদম্য কৌতূহল লক্ষ্য করেই একটু হাসে ঠোট টিপে, তারপর মাথা নেড়ে জানায়—না।

—না?

নাগমণি আবার হেসে বলে—না।

সে কী—কোথায় যাবি তাহ'লে?

—যেদিকে খুসী।

সোমনাথ একটু অবাকই হয় ওর কথায়—বলে,—কেন রে, ওদের ভালো লাগে না?

—লাগে।

—তবে?

নাগমণি আবার হাসে, বলে—জানো তো আমি নাগিনী, আমার থাকা উচিত নয় কোনো সংসারে। কাকে ছোবল দেবো তার ঠিক আছে?

বলেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে ওঠে নাগমণি। সোমনাথ বলে, সত্যিই তোরা বেশ—বেশ তোদের জীবন। অকারণে তোরা খুসী হয়ে উঠিস, আনন্দে তোদের জীবন ভরা।

আবার তেমনি হেসে ওঠে নাগমণি,—বুঝি না তোমার কথা, বলছ কী?

—বুঝি কী?—বলছি, আমাকে তোর বন্ধ ব'লে ভাববি?

—লছমীর মতো ?

—হ্যাঁ।

গাঙ্গীর্থ্যের ভাণ করে নাগমণি, বলে—তারপর ?

—তোমার সব কথা আমাদের বলবি। তোমার স্বপ্ন-দুঃখ, আশা-আনন্দ—সব কথা।

—কেন, বল তো ? শুনে তোমার লাভ ?

—লাভ ? লাভের কথা জানি না—কিন্তু বেশ লাগে তোদের কথা শুনে, তোদের জীবনের ধরণ-ধারণ দেখতে।

নাগমণি এবার সত্যি সত্যিই গাঙ্গীর হয়ে যায়, বলে—তোমাদের মাঝে মাঝে ভয় করে আমার।

—ভয় ?

হ্যাঁ, ভয়। তোমরা, তন্দর-নোকেরা কত সুন্দর সুন্দর কথা বল, আমাদের জাতের পুরুষরা তা পারে না। তোমাদের কথা শুনে খুব ভালো লাগে—কিন্তু কথা যখন তোমাদের থেকে যায়, তখনই লাগে ভয়।

—তাহলে আমাদেরও তুমি ভয় করিস, নাগমণি ?

—হ্যাঁ, সকালে যখন থেকে তোমাকে ওদের মধ্যে দেখছি, তখন থেকেই ভয় করে আসছি। তুমি তন্দর-নোক, তার বেরামণ—তুমি ওদের মধ্যে কেন ?

রীতিমত চমকে ওঠে সোমনাথ—এক অতি সাধারণ গ্রাম্য মেয়ের মুখে এ কী শুনেছে সে ?

ওর বিস্তৃত বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে বাঁকা হাসি হাসে নাগমণি—বলে, অনেক পোড় খেয়েছি জীবনে, আমি এদের চেয়ে অনেক বেশী জানি—বেশী চিনি এই তন্দর-নোকদের ; এরাই আমার জীবনের হুঁট-গ্রহ—এদেরই ভ্রাতা আজ ঘর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে, ভাই-বোনদের ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছি।

বলতে বলতে দু'চোখ জলে ওঠে যেন নাগমণির—ওর জীবনের সমস্ত আলা-বদলা যেন বিছাতের মতো স্বলমল করতে থাকে। বলে—আমার কাহিনী সবটা শোন নি। একটু আগে, আমাদের স্বপ্ন-দুঃখের কথা শুনে চাও বলছিলে না ? শোন তবে—

মুখটা নিচু করে সোমনাথ। মেয়েটা ক্রমশঃই রহস্যময়ী হয়ে উঠছে তার কাছে। বাস্তবিকই, কে এই নাগিনী, তার নামনে দাঁড়িয়ে ?

সিঁড়ির দিকটা একবার দেখে নিয়ে নাগমণি বলতে শুরু করে—তুমি বেরামণ, 'দেবদাসী' প্রথার কথা তোমাকে নতুন করে শোনাতে হবে না। এ প্রথা একেবারে কমে এলেও অল্প আরেক রকমে এর ধারা এখনো ব'য়ে চলেছে ; রাখো কী তার ধর ?

—কিছু কিছু রাধি।

—আমি তেমনি একটি ভাগ্যহীনা মেয়ে। আমি গাঁয়ের মেয়ে, গাঁয়ের চাষীর ঘরে জন্মালেও আমাদের নাচ গান শিখতে হয়েছে।

অবাক্ বিশ্বয়ে স্থাপুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে সোমনাথ। এদের কথা সে শুনেছে বৈ কি। কিন্তু এভাবে এরকম পরিস্থিতিতে যে এমনি একটি মেয়ের সামনাসামনি তাকে দাঁড়াতে হবে, এ সে ভাবেনি।

বাঁকা হাসে নাগমণি, বলে—বেরামণ, আমার আসল নাম নাগমণি হলেও আমার নর্তকী-জীবনের একটি পোষাকী নাম আছে,—কী জানো সেটা ?—'বসন্তসেনা'। এই চন্দ্র-সেনার কথা শুনে চাও ?

সোমনাথ বাধা দিয়ে বলে,—তোমরাই কি তবে, বাঁদের বলে নাগাশাপু ?

—হ্যাঁ। আমরাই নাগাশাপু ; ভালো কথাই যাকে বলে নাগবাসী—অর্থাৎ পুরাকালের নাগরাজ্যের কন্যা। আমরা এক বিশেষ জাত, ব্রাহ্মণ। আমাদের জাতের মেয়েরাই একদিন দেবদাসী হয়েছে। আজ ত মন্দিরে দেবতা নেই, আছে পাখর। আজ পূজা হয় মাহুঘের। আমরাও তাই দেবতা ছেড়ে মাহুঘের পূজা ধরেছি।

—বলে আবার খিগখিগ ক'রে হেসে ওঠে নাগমণি। তারপর হাসি থামিয়ে আবার শুরু করে,—আজকাল অবশ্য জাতের গরম ভতটা নেই। শুধু আমরা কেন, আজ কতো জাতের মেয়েরা অভাবের তাড়নায় নাচগান সঞ্চল ক'রে মাহুঘের পূজায় নেমেছে।

—তারপর ?

—তারপর ? এইভাবেই চন্দ্রসেনার জন্ম। আমার বাবা 'নাগবাসী' হয়েও আরও বহু লোকের মতো গ্রামে গিয়ে চাষবাসের কাজ নিয়েছেন। আমার সং-মা চাষীদেরই মেয়ে। কিন্তু আমাদের ভালো চোখে কোনে

কালেই দেখে না। আমি খুব ছরস্ক ছিলাম, আমার সংগে প্রায়ই রূপড়া-মারামারি লেগে থাকত। বড়ো হলাম এইভাবে,—আর আমাদের বাড়ীর আশেপাশে ভদ্রলোকের আনাগোনা বাড়ল। ইসারা-ইঙ্গিত, এটা-ওটা মাকে বা বাবাকে উপহার, বুললে?

—বুললাম।

নাগমনি বলল—আমার সং-মায়ের উচ্চানির পর বাবা শেষে রাজী হলেন। আমি আমার কুলির বৃত্তিই নেবো বলে ঠিক হলো। সহরে এলাম নাচগান শিখতে, লেখাপড়া ও কিছু কিছু জানতে। প্রথম-প্রথম বেশ লাগত, কোনো উৎপাত ছিল না, আমি তখন মাত্র শিখতে এসেছি। নাচ বড়ো ভালো লাগত। ভাবতাম এই নাচের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখব। কিন্তু তার পরের পাঠে এসেই ভুল ভাঙল। শুরু হলো শেখবার শেষ ধাপ—কামকলা! সইতে পারলাম না,—সব ছেড়ে একদিন পালিয়ে এলাম। চক্রেসনাকে পুড়িয়ে জালিয়ে নাগমনি ফিরে এলো তার গাঁয়ে। কিন্তু সেখানেও কী নিস্তার আছে? সহর থেকে লোক এলো আমার পিছুপিছু,—এই তোমারই মতো ভদ্রলোক। সবার জালায় শেষে ঘর ছেড়ে পথে বেরুলাম। ভাবলাম, শ্রমিক-মেয়ের মতো খেটে খাবো। দেখলাম, তাতেও জালা কম নয়। জালা আর জালা! যেখানেই যাই সেখানেই এই জালা,—কী করি, কোথায় যাই, বলতে পারো?

—থাকো না এখানেই?

আবার বীকা হাসি হাসল নাগমনি, কী রকম? তোমার কাছে?

—ছিঃ ছিঃ, এ কী কথা! খিল খিল করে হেসে উঠলো নাগমনি।

অতর্কিতে প্রচণ্ড আঘাতই এসে পড়ে সোমনাথের মনে—চাবুকের মতো একটা তীর কষাঘাত। বীকা পথে ছোট্ট মেয়েটার মনও হ'রে গেছে বীকা। ধরা গলায় কোনক্রমে বলে সোমনাথ,—তুই ভয়ানক ভুল করছিস বোন। আমি আজ থেকে সত্যিই তোমার মায়ের পেটের ভাই। শোন তবে আমার কথা। আমিও তোমার মতো হতভাগ্য। আমারও মা নেই, আছে সংমা। আমাকেও বাড়ী

থেকে, বাড়ী থেকেও কেন, সমাজ থেকে বের ক'রে দিয়েছে।

এবার অবাধ হবার পালা নাগমনির, বলে,—কেন?

—সে অনেক কথা। তবে এটুকু শুনে রাখ বোন, আমার কোনো জাতি নেই; আমি ব্রাহ্মণ নই, অ-ব্রাহ্মণও নই,—আমি অগণিত ভারতবাসীরই একজন। এ ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই আমার।

নাগমনি বিস্ফারিত নেত্রে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, হতভাগ্য-পারে-পারে একটু এগিয়েও আসে ওর দিকে, বলে,—তোমাকে তাকিয়ে দিয়েছে কেন বাড়ী থেকে?

—আমার মা—আমার অত্যাচারিতা, অবহেলিতা অগণমানিতা মা, সে-ও তোমার মতো এমনি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসে বালক পুত্রের হাত ধরে বিজোহীর মতো;—এই গোদাবরীই তাকে স্থান দিয়েছে বুকে—এই গোদাবরীর জলেই মিলিয়ে আছে মায়ের পুণ্যদেহ,—তাই গোদাবরী-মাকে ছেড়ে কোথাও চলে যেতে পারি না। জানিস বোন, আমার খুব খারাপ রোগ হয়েছে,—যক্ষ্মা!

—যক্ষ্মা!

—হ্যাঁ, জানিস, রোগটা কি?

—জানি। কিন্তু...

সোমনাথ বলে,—হ্যাঁ বোন, ব্রাহ্মণ-গল্লীতে যা, জিজ্ঞাসা কর আমার কথা। সবাই বলবে। শুধু কোণ্ডারা এসব বলে না, বোঝেও না, বিশ্বাসও করে না। ঐ কোণ্ডাই আমাকে সেবা ক'রে বাঁচিয়েছে।

—কোণ্ডা?

—হ্যাঁ। কোণ্ডার মতো শ্রমজীবীই আজ আমার বন্ধু এবং সঙ্গী। তোমার মতো, ভদ্রলোকদের আমিও ভয় করি,—এড়িয়ে চলি।

নাগমনি ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ নিম্পলকে, তারপরে অশ্রুটকণ্ঠে বলে,—তুমি সেয়ে গেছ?

একটু স্থান হাসি হাসে সোমনাথ,—না রে নাগমনি! আমি কেন, কেউই সারেনি। আমাদের সংবিস্তের স্নায়ুতে স্নায়ুতে এই রোগ। সম্মেহ—অবিশ্বাস—স্বপ্না—অসাম্য আর পরলীকাতরতা।

—আমি বুঝছি না তোমার কথা।

একটু থেমে সোমনাথ বলতে শুরু করে তার ইতিহাস।
সং-মাকে নিয়ে তার পিতার সন্দেহের কথা, ক্ষয়-রোগ
প্রচারের কথা। কাহিনীর শেষে মুখ তুলে দেখে, নাগমণির
চোখে টলটল করছে অশ্রুর বিন্দু। দিনের আলো নিভে
গিয়ে কখন রাত্রি নেমে এসেছে, রাত্তার আলো এসে পড়েছে
তীব্রভাবে ওদের মাথানে,—তারই আভাষে নাগমণির
কমনীয় মুখখানা উদ্ভাসিত।

নীচে থেকে অকস্মাৎ কোণার কণ্ঠস্বর শোনা যায়,—
পণ্ডিত, পণ্ডিত? নাগমণি সেই স্বর শুনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে
যায় সিঁড়ির দিকে। সোমনাথ ঢোকে ঘরের ভিতরে,
দাঁড়ায় গিয়ে জানালার কাছে—সাদা দেয়,—কী?

কোণা দাঁড়িয়ে জানালার ঠিক নীচে, লছমী হস্ত ব্যস্ত
রান্নার তদারক, বুড়ো নোকমা মাথায় পাগড়ী বেঁধে দাঁওয়ার
ওপর বসে সর্দারের মতো, তাকে ঘিরে আরো কয়েকজন
রজকের ভীড়। রাত্তার আলোটা বেশ উজ্জ্বল করে
রেখেছে ওদের উঠানটাকে। বুড়ো নোকমা তাকে দেখে
উঠে দাঁড়ায়, প্রণাম জানিয়ে বলে,—একবার এখানে আসবে,
পণ্ডিত?

—যাচ্ছি।

দাঁওয়ার একপ্রান্তে আসন পেতে তাকে বসতে দেয়
লছমী। কোণা বসে তার পায়ের কাছে, পাশে নোকমা।
নাগমণিকে দেখা যাচ্ছে না, কিসের আড়ালে গিয়ে
সে নিভেকে লুকিয়েছে, কে জানে! নোকমা বলে,—
পণ্ডিত, তুমি আমাদের লোক। তোমাকে আমাদের একটা
দরখাস্ত লিখে দিতে হবে।

—কীসের দরখাস্ত, নোকমা?

—এই দেখ না, এই সব লোক আমাকে আর যেন
সর্দার বলে মানতেই চায় না।

এই কথা বলার সংগে সংগে উপস্থিত জনমণ্ডলীতে একটা
প্রতিবাদের গুঞ্জন ওঠে, কোণা থামিয়ে দেয় তাদের।
নোকমা বলে,—তবে বিশ্বাস করে না কেন আমার কথা?
আমাদের অবস্থা বাস্তবিকই খারাপ হয়ে যাচ্ছে পণ্ডিত।
সরকার আমাদের ঠিকমতো 'সোডা' দেবে না,—আমরা
'চাউডুভুমু'তে গিয়ে অতিকষ্টে 'চাউডুভুমু' যোগাড় করে
আনি বটে, কিন্তু তাতে কাপড় খুব ফর্সা হচ্ছে না, গৃহস্থরা

মোটাই পছন্দ করছে না। সোমনাথ জানে, এই 'চাউডু-
ভুমু'টা কী। ধানের জমি হচ্ছে 'চাউডুভুমি।' ধানের
জমির ওপরে অনেক সময় লবণের মতো যে সাদা আস্তরণ
পড়ে, তাই সবজি সংগ্রহ করে আনে স্থানীয় রজকের দল,—
কাপড় কাচার জন্য সোডার বদলে ব্যবহার করে।

—কী লিখব, নোকমা?

নোকমা আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে—পণ্ডিত, তুমি
আমাদের মা-বাপ। এমন করে লিখবে যাতে সরকার
বাহাদুরের মন গলে—যেন আমাদের 'সোডা'র বরাদ্দ
বাড়িয়ে দেয়। কী বলো হে তোমরা? সোডা না পেলে
চলবে কী করে আমাদের ব্যবসা? খাবো কী? সমস্বরে
সবাই বলে ওঠে,—নিশ্চয়-নিশ্চয়!

ক্রমে রাত বাড়ে। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়ে যায়,
সোমনাথ ওদের 'সোডা'র জন্য দরখাস্ত লিখে দেবে, এবং
শুধু তাই নয়—সরকারী অফিসে গিয়ে ওদের হয়ে দরবার
করবে। সোমনাথের নামে জরখনি তুলে যে-যার ঘরে
ফিরে যায়, কোণা তো আবেগে ওর পা-ই জড়িয়ে ধরে।

সবাই চলে যাবার পর লছমী আসে এগিয়ে ওদের কাছে,
বলে, বাবা, কোণাকে একটু বকুনি দাও, ও আজও পরসাদ
চেয়েছে।

কোণা অমনি লাফিয়ে ওঠে তার আসন থেকে,—এই,
খবরদার! চেয়েছি পরসাদ।

—বটে, চামনি!

ওদের ঝগড়া হয়ত জমে উঠত আরো, হঠাৎ নাগমণির
খিলখিল-হাসির শব্দে ওরা দুজনেই থেমে যায়। নোকমা
বলে,—কে রে? ঐ মেয়েটা বুঝি?

লছমী বলে,—হ্যাঁ বাবা।

নোকমা বলে,—ঐ দেখ পণ্ডিত, কোণা ত ছিলই এক
পাগল, এখন আরেক পাগলী এসে জুটেছে।

সোমনাথ বলে,—সে কী নোকমা, তুমি কী মেয়েটাকে
পছন্দ করছ না? এই যে শুনলাম...

বাধা দিয়ে নোকমা বলে ওঠে,—ঠিকই শুনেছ পণ্ডিত।
মেয়েটাকে পছন্দ না করে আমার উপায় আছে? আমার
লছমী-মায়ের যখন পছন্দ অভিমানরূপ কণ্ঠে লছমী বলে
ওঠে,—বাবা?

—হ্যা, হ্যা, ঠিক—বুঝলে পণ্ডিত, মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ। কী নাম যেন মা তোমার—নাগমণি? তা' বেশ! থাকো মা থাকো, আমার ঘর আলো করে থাকো। কিন্তু দেখিস বেটা, দিদির সংগে ঝগড়াঝাঁটি করিস না!

বলতে বলতে উঠে পড়ে নোকরা, বলে,—এসো পণ্ডিত, তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।

বাইরে এসে গম্ভীর হয়ে যায় নোকরা, বলে,—পণ্ডিত, খুব বিপদ এবার আমাদের।

—সে কী!

—হ্যা, পণ্ডিত। এবার না খেয়ে মরতে হবে। সহরে “ডাইক্লিনিং” ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

—ডাইক্লিনিং বাড়ছে, তাতে তোমাদের কী?

—আমাদের ভয় এখানে পণ্ডিত। ভক্তলোকের ছেলেরা যদি এ ব্যবসায়ের নামে, তাদের সংগে কী আমরা পারব? গৃহস্থরা সব ‘ডাইক্লিনিং’ পছন্দ করছে। আমাদের অন্ন বুঝি এবার গেল।

—ব্যাপারটা বুঝি না সর্দার। ওরা ত আর নিজেরা কাটছে না কাপড়।

—তা' কাটছে না অবশ্য। ওরা গৃহস্থবাড়ী থেকে কাপড় নিয়ে আমাদের দিয়েই না হয় কাটাচ্ছে। কিন্তু কী রকম সাজানো দোকান-ঘর, কেমন কাগজে-মোড়া নম্বর-মারা কাচা কাপড়গুলি সাজানো থাকে, লোকে ঐ সবই পছন্দ করছে বেশী। আমাদের থাকতে হচ্ছে ঐ ভক্তলোকদের তাঁবে। গৃহস্থবাড়ী গিয়ে ‘মা ব’লে দাঁড়ানো,—এ সম্পর্কটা আস্তে আস্তে এ সহর থেকে উঠে যাচ্ছে, পণ্ডিত।

—ভাববার কথা বটে।

—ভাবো পণ্ডিত, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু।

বন্ধু! ঘরের আলো নিভিয়ে অন্ধকার ছাড়ে শুয়ে, থেকে থেকে এই কথাই বার বার ওর মনের মধ্যে পাক খেয়ে উঠেছে। এদের যথার্থ বন্ধু হবার যোগ্যতাই আগে অর্জন করতে হবে তাকে। কাজ খুঁজছিল সে,— এই ত তার কাজ—ওদের হৃৎ-হৃদয়া-সমস্তার সমতাপ্তি হওয়া।

—ক্রমশঃ

মুহূর্ত্ত বিলাস

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

অতলান্ত আকাশেব অসীম বিস্তৃত দুটি চোখে,
মন ছুঁয়ে নীলাঞ্জন অরণ্যের ছায়াটুকু ফিরে।
সমুদ্র-মহন-শেষে মর্ত্ত্যলোকে এলে সশরীরে,
তোমার কথিকা বুঝি ধরা পড়ে শ্রাবণের শ্লোকে।

প্রাত্যহিক জীবনের ব্যথাবিদ্ধ গাঢ় অন্ধকারে
তুমি এলে অকস্মাৎ জ্যোতির্ময়ী কোজাগরী নিশা।
মোহভ্রান্ত সাবনিক খুঁজে পেল আলোকের দিশা,
পথ-চলা ক্লাস্তিটুকু মুছে গেল প্রেমের জোয়ারে।

জীবনে যৌবন এলো, এলো চিন্তে ছরস্তু উল্লাস,
চূর্ণিয়া বিপত্তি বাধা জেগে উঠে বলিষ্ঠ শপথ।
নবীন ব্যঞ্জন্য নিয়া দেখা দিল নবীন জগৎ—
সব কিছু অর্থময় চন্দ্র-তারার, পুষ্প-লতা-ধাস।

মুহূর্ত্ত জাগালে মনে অনিবার্য জীবনের জয়,
হৃদয়েব বন্ধনে সেই মুহূর্ত্তেরে করিছ অক্ষয়।

কাব্য-উৎস

শ্রীনির্মল কুমার চট্টোপাধ্যায়

নন্দন কাননে যবে বিমোহিত চাক ইন্দ্রজালে
ফুটে ওঠে অন্তরেব চিরন্তন বিমুক্ত-স্বপন;
শুভ্র শতদল-মাঝে অমলিন সৌরভ-মগন
কবিরাজ জেগে ওঠে চন্দ্রালোকে পত্র-অস্তুরালে।

বিস্মৃতিত এ-মানস অপরূপ মৌন-স্বপ্নায়:
পল্লবিত নিকুঞ্জেতে গাহি' উঠে আপন-উল্লাসে;
হৃদোন্মিত পুষ্পদল আশ্রয়ারা সুবাসেতে ভাসে।
অপ্সরদেশে স্বপ্নভোর এ-হৃদয় রূপে মূরছার।

অস্তহীন সঙ্গীতের অপরূপ প্রতিধ্বনি মাঝে,
কুহুম-সৌরভ তরার চির-আমোদিত উপবনে—
কাব্য-কথা শত বসন্তে প্রসূতিত হয় কণ্ঠে জগে!
অমরার বার্তা জাগে পূর্ণিমা-কিরণ মাঝা মাঝে।

হৃদয়ের দ্বার খুলি' বাহিরিয়া আসে কাব্য-ছবি,
বিশুদ্ধ-জ্যোতিষাধারা যুগে যুগে করে মোরে কবি ॥

রবীন্দ্রনাথের কাব্য শিশু

শ্রীশান্তি চক্রবর্তী

শিশুজ্ঞানের উন্মেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট বিশ্বের রূপ তাহাকে বিস্তৃত করিয়া দেয়। সে তখন তাহার অবাধ চাহনিতে প্রকৃতির অপূর্ণরূপ দেখিতে থাকে। এই রূপই তাহার ক্ষুদ্র অন্তরে যে রেখাপাত করে তাহার ফলে সে হয় কল্পনা-প্রবণ এবং তাহার ক্ষুদ্র মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিতে চায় আবেল তাবোল ভাষায়। আমরা এই আবেল তাবোল ভাষার অর্থ বুঝিতে পারি না, দেখিতে পাই না শিশুর বিচিত্র রূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শিশুর এই বিচিত্র রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন তাঁহার মনঃতাত্ত্বিক দৃষ্টি গহ্বর। সেই জন্তই আমরা শিশুর বিচিত্র রূপ এবং তাহার ক্ষুদ্র মনের বিচিত্র অভিব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের নানা কবিতার মধ্যদিয়া দেখিতে পাই এবং আমরা কিছুটা বুঝিতে পারি যে শিশুর কল্পনাপিণ্ড মন কি চায় এবং শিশুর রূপ কি।

কবি তাঁহার কাব্যতুলিকার সাহায্যে কবিতার মধ্যদিয়া শিশুকে কখনও ধীর, কখনও ভাবুক কখনও কল্পনাপ্রবণ রূপে এক অপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

একটি চিত্রে আমরা শিশুর ভিজ্ঞান নেত্র দেখিতে পাঠি; কবি এই নির্বাক দৃষ্টিতে ভাষা দিয়া আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন। মা যখন তাঁহার শিশুকে আদর করেন, চুমো খান, তখন সে তাহার ডাগর ডাগর চোখ মেলিয়া মায়ের স্নেহ-কাতর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। সেই নির্বাক দৃষ্টির মধ্যদিয়া কবি দেখিতে পান শিশুর অবোধ্য জিনিষ জানিবার প্রবল আগ্রহ। কবি তাঁহার কাব্য তুলিকা দিয়া আঁকিয়াছেন—“থোকা থাকে শুধায় ডেকে

এলেম আমি কোথা থেকে

কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।”

অন্য একটি চিত্রে দেখিতে পাই শিশু মনের অপূর্ণ আবর্তন। দিনরাত্রির আবর্তনে শিশুমনেও কল্পনার এক বিচিত্র আবর্তন ফেলিয়া যায়, তাহার ফলে সে রাত্রিকে দিন এবং দিনকে রাত্রি কল্পনা করিয়া বেশ একখানি ছোট ছবি

আঁকে। কিন্তু সেই আবেগ তাহার ক্ষুদ্র মনে চাপিয়া রাখিতে পারেনা, অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসে। কবি সেই প্রশ্নের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন :—

“মনে করুন! সন্ধ্যা হোলো যেন,

রাতের বেলা ছপূর যদি হয়

ছপূর বেলা রাত হবে না কেন।”

অন্য একটি চিত্রে শিশুর সমবেদনার রূপ দেখিতে পাই। সাধারণতঃ দেখা যায় যে ছোটশিশুর পশু পক্ষীর উপর অদ্ভুত ভালবাসা; সেই পশুপক্ষীকে অবহেলা এবং তিরস্কার করিতে দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র অন্তরে বেদনা জ্বলি উঠে এবং নিজেকে তাহাদের সাথী মনে করিয়া ব্যাধীকাতর ভাষায় থাকে ভিজ্ঞান করে। কবি সেই সমবেদনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

“যদি থোকা না হ’য়ে

আমি হতেম কুকুর ছান।

তবে পাছে তোমার পাতে

আমি মুখ দিতে বাই ভাতে

তুমি ক’রতে আমায় মানা।”

এরূপ প্রশ্নের সঠিক উত্তর মায়ের নিকট হইতে না পাইয়া মায়ের উপর তাহার হয় অভিমান। সেই অভিমানের চিত্র ও অঙ্কিত করিয়া কবি বর্ণনা করিয়াছেন :—

“মা মা, তবে বা মা,

আমায় কোলের থেকে নামা।

আমি খাবনা তোর হাতে

আমি খাবনা তোর পাতে ॥”

অহংকরণপ্রিয় ছোট শিশুর মনে বিচিত্র সাধের উদয় হয়। পাঠশালার অবরুদ্ধ কক্ষে তাহার ক্ষুদ্র মন আনন্দানু করে, সে তখন তাহার বিচিত্র সাধগুলি দিয়া ছবি আঁকে। কবি শিশুর বিচিত্র সাধের ছবিগুলি শুনে তরে অঙ্কিত করিয়া

আমাদের দেখাইয়াছেন। একথা নিশ্চয় কবি দেখাইয়াছেন পাঠশালার বন্ধন কাটাইয়া শিশুর ফেরীওয়ালা হওয়ার নাথ—

“চুড়ি চাই, চুড়ি চাই” সে হাঁকে
ইচ্ছে করে শেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।”

কল্প একটা চিত্রে কবি দেখাইয়াছেন যে স্বাধীনতাপ্রিয় শিশু মায়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য বাগানের মালী হইতে ইচ্ছা করে, কারণ তাহার মন মালীর ঐরূপ স্বাধীনভাবে ধূলাবালি মাথার দিকে যায়।

“মা তা’রে তো পরায় না মাক জামা
যুয়ে দিতে চায় না ধূলোবালি,
ইচ্ছে করে আমি হতেম যদি
বাবুদের ঐ ফুলবাগানের মালী।”

শিশুর ধূলাবালির উপর যে স্বাভাবিক লিপ্সা তাহাও কবিতাটির মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শিশু কিছুতেই ঘুমাইতে চায় না; তাহার মনে তখন কত কি আবোল ভাবোল চিন্তার তরঙ্গ একটীর পর একটা আঘাত করে। মা ঘুমপাড়ানী গান গাহিয়া শিশুকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করেন; শিশু তখন গলির পাহারাওয়ালার কথা ভাবিতে থাকে, তাহার ইচ্ছা ঐ রকম পাহারাওয়ালার সাজিয়া গলির ধারে সমস্ত রাত্রি আগিয়া রাত্রির সব কিছু জানিতে। তাহার সেই ইচ্ছাকে কবি ভাষা দিয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন :—

“রাত হ’য়ে যায় দশটা এগারোটা
কেউ তো কিছু বলেনা তার লাগি,
ইচ্ছে করে পাহারাওলা হ’য়ে
গলির ধারে আপন মনে আগি।”

অনুকরণপ্রিয় ছোট শিশু তাহার ক্ষুদ্র জীবনপথে বাহাই দেখে মনে মনে অনুকরণ করিয়া প্রকাশের পথ খুঁজিয়া লয়। মাষ্টারের পড়ানো দেখিয়া তাহারও ইচ্ছা হয় মাষ্টারী করার। সে তাহার ইচ্ছা পূরণ করে পোষাকুর বিড়ালের উপর। কবি শিশুর এই ইচ্ছাকে ভাষা দিয়া একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন :—

“আমি আজ কানাই মাষ্টার,
পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি,
আমি ওকে মারিনে মা বেত
মিছি মিছি বসি নিয়ে পাটি।
রোজ, রোজ দেয়ী ক’রে আসে
পড়াতে দেয়না ও তো মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলে, হাই
যত আমি বলি “শোন, শোন”।
দিনরাত খেলা, খেলা, খেলা,
লেখা পড়ায় ভারি হেলা,
আমি বলি—চ, ছ, জ, ঝ, ঞ,
ও কেবল বলে মিরেঁ মিরেঁ।”

এই কবিতাতে শিশুর মাষ্টারী ধরণের শাসনের ভঙ্গী এবং ছাত্রের অনন্যোযোগ কবি বর্ণনা করিয়াছেন; এইখানে এইটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়ার সময় ছাত্রের প্রতি যে ব্যবহার তিনি করেন ছোট শিশুর মনে তাহার ছাপ পড়িয়া যায়; পরে সে খেলাচ্ছলে তাহার খেলার সাথী কিংবা পোষা বিড়াল কুকুরের উপর তা প্রয়োগ করে। সুতরাং শিক্ষকের ছাত্রের প্রতি ব্যবহার শিক্ষণীয় এবং মধুর হওয়া উচিত। কখন কখন আট দশ বৎসরের বালক তাহার ছোট ভাইয়ের উপর কর্তৃক খাটাইয়া বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে চায়। তাহার এই বুড়োমীর চিত্রে কবি অঙ্কিত করিয়াছেন :—

“তোমার খুকী চাঁদ ধরতে চায়,
গণেশকে ও বলে যে মা জাহ্নবী,
তোমার খুকী কিছু বোঝে না মা,
তোমার খুকী ভারি ছেলে-মামুষ।

P 36171

শিশুর নিকট তাহার শৈশবকাল ভাঙ্গা লাগেনা, তাহার বাবা দাদার মত বড় হইতে তাহার ইচ্ছা করে। এই ইচ্ছা তাহার কল্পনার খোরাক জোগায়। সে কল্পনা করে নিজে বড় হওয়ার এবং দাদাকে ছোট হওয়ার এবং ইহাও কল্পনা করে যে সে তখন তাহার বড় দাদাকে ছুটমীর জন্য শাসন এবং পড়ার তত্ত্ব তড়ুনা করিবে। ছোট শিশুর এই ইচ্ছাকে রূপ দিয়া কবি বর্ণনা করিয়াছেন :—

“এখনো তো বড়ো হইনি আমি
ছোটো আছি ছেলে মানুষ ব’লে,
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হইবো
বড়ো হ’য়ে বাবার মত হোলে !
দাদা তখন পড়তে বসি না চায়,
পাখীর ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
তখন তারে এমনি ব’কে দেব,
বলব, “তুমি চুপটি ক’রে পড়ো”,
বলব, “তুমি ভারি ছষ্ট ছেলে।”

কল্পনাপ্রবণ শিশু মা’র কোলে বসিয়া নিভেতে বীরপুরুষ
কল্পনা করে। তাহার কল্পনার প্রতিচ্ছবি—মাকে যেন
বহু দূর দেশে লইয়া যাইতেছে; ইতিমধ্যে ডাকাত তাহার
মাকে আক্রমণ করিল কিন্তু বীর খোকা তাহার হারাইয়া
তাহার মাকে রক্ষা করিল। ছোট শিশুর এই বীরত্বব্যঞ্জক
কল্পনা লইয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার কাব্য তুলিকার সাহায্যে
সুন্দর একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে,

এমন সময় ‘হাঁরে রে, রে রে রে’
ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে,
তুমি ভয়ে পালকিতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছো মনে।

* * *
আমি যেন তোমার বলছি ডেকে
আমি আছি, ভয় কেন মা করো।
কি ভয়ানক লড়াই হোলো মা যে
শুনে তোমার গারে দেবে কাঁটা,
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়লো কাঁটা।

ছোট শিশু ঠাকুর মার মুখে রাজ্য রাণীর গল্প, আত্ম
সহকারে শুনিয়া পরে সে সেই গল্পটী মনে মনে আলোচনা
করে এবং কল্পনা করে তাহার নিজস্ব রাজবাড়ীর। কবি
শিশুর এই কল্পনা ভাষা দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমার-রাজার বাড়ী কোথায় কেউ জানেনা সে তো,
রূপো দিয়ে দেয়াল গাঁথা সোনা দিয়ে ছাত,
থাকে থাকে সিঁড়ি ও বে সাদা হাতির দাঁত,
সাত মহলা কোঠায় সেথা থাকেন ছুয়োরানী,
সাত রাজার ধন মাণিক গাঁথা গলার মালাখানি।

রাজার গল্পে শিশুর মনে কতখানি রেখাপাত করে এবং
সেই সঙ্গে তাহার কল্পনা শক্তি কতখানি প্রসার লাভ করে
কবি এই কবিতার মধ্য দিয়া তাহা কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।
বর্ষার দিনে প্রত্যেকের অন্তরেই উদাসীনতা আসে।
শিশুর ক্ষুদ্র অন্তরেও এই উদাসীনতা আসে বর্ষার দিনে।
তাহার মন তখন চলিয়া যায় কোন্ এক তেপান্তরের
মাঠের ওপারে সুয়োরানী, ছুয়োরানীর অন্তঃপুরে। কবি
শিশুর এই উদাসীনতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

মনে পড়ে সুয়োরানী

ছুয়োরানীর কথা,

মনে পড়ে অভিমানী

কক্কাবতীর ব্যথা।

বাড়ীতে যখন বৃদ্ধ ঠাকুরা রামায়ণ পাঠ করেন বাড়ীর
শিশুরা মনোযোগ সহকারে শোনে এবং পরে রামায়ণের
বিষয়টি-রূপ ধরিয়া তাহাদের কল্পলোকে বিচরণ করে। সেও
চিন্তা করে বাবা যদি তাহাকে রামের মত বনে পাঠাইয়া
দিতেন তবে সে স্বাধীনভাবে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে
পারিত। শিশুর মনের এই অভিলାষ কবি ভাষা দিয়া
বর্ণনা করিয়াছেন :—

বাবা যদি রামের মত পাঠায় আমায় বনে
যেতে আমি পারিনে কি
তুমি ভাবছ মনে ?
ডালের পরে মন্থর থাকে
পেখম পড়ে ঝুলে,
কাঠবিড়ালী ছুটে বেড়ায়
জাজটি পিঠে তুলে।

ছোট শিশুর মনেও ভাবপ্রবণতা এবং তুলনামূলক
ভাব দেখা যায়। কবি তাহা বর্ণনা করিয়া আমাদের
দেখাইয়াছেন।

(শেষাংখ ৭৮ পৃষ্ঠার নীচে)

জাগো

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ধ্যানের দেবতা তুমি জাগো, জাগো, নয়নাভিরাম,
হৃদয় নিভাড়া তোমা নিবেদিত প্রাণের প্রণাম।
বুচাও সংশয় মোহ, অবিস্মার ভয়ঙ্কর কালো,
নিষ্কলক বর্ণহীন আলো দাও, শুধু দাও আলো।
জড় বক্ষে দেখি যেন অপকৃপ প্রাণের বিকাশ,
নিবিশেষ দীব্য জ্যোতি পরিব্যাপ্ত করুক আকাশ।

স্তব্ধ মৌন প্রতিধ্বনি আনন্দের উর্জুক আহ্বান,
অমৃতের পুত্র গাক আঁধারের নিরঞ্জন গান।
গণ্ডদীপা পৃথিবীর কোন্‌খানে তোমার উদয় ?
গেল কত মাস, বর্ষ, তবুও এলে না জ্যোতির্ময়।
'সম্ভবামি' বলেছিলে এসো, এসো কাদে জনগণ,
ধন্য করি নরজন্ম নবরূপে জাগো নারায়ণ।

তুমি

ধীরানন্দ ঠাকুর

কত খনের আকুল-চাঁওরা,
কতদিনের প্রতীক্ষিত তুমি যেদিন এলে,
এলে আমার ঘরে,
এসে আমার কাছে, সঁপে-দিলে নিজেকে
সকল বাধার জুর্ভাবনার হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে,
কোনো কথার অপেক্ষা না রেখেই সেদিন যখন বললে,—
“এখন থেকে তুমি হলে আমার একান্ত আমার,
নিজেকে নিয়ে করতে পারবে না আর হেলা ফেলা,
কোনো অধিকার রইলো না আর তোমার নিজের ওপর,
তবে, আমার ওপর রইল তোমার সকল স্বত্ব,
সে-অধিকারে কিছুই থাকবে না আমার বলার,”—
তখন যে-অহুত্ব উঠেছিল অসীম উজ্জসিত হয়ে
তার প্রকাশের ভাষা গিয়েছিল থমকে,
বিস্ময়-বিমূঢ়, অক্ষমতা-লজ্জিত ভাষা
মরমে মরে-গিয়েছিল তখন।
আজ তাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারি
শক্তির এমন স্পর্ধা রাখিনে এখনো;
তবে, সেদিনের যে-বিপুল অল্পভবর
উদ্‌গাম বান্ধার চিহ্ন রয়ে গেছে মনের এখানে-সেখানে,
যার প্রলয়-নতনের সংগীত রেশ
এখনো কাঁপছে স্রবণের সমীর-তরংগে
তার কথা বলতে সাহস হয়েছে মনে।
তুমি যখন এলে তখন বেলাটা ছিল সকাল,

আগের রাতের মেঘলা-মেঘলা ভাব-কেটে-বাঁওরা
হেমন্ত-প্রভাত;
আগের রাতটা ছিল কোমলী-কান্ত,
কিন্তু ভাঙা-ভাঙা মেঘে যেন বিরহ-ধ্বনি, বিষন্ন-শূন্য;
কাক-জ্যোস্নায় ধরণী ছিল চেতন-অচেতনের
মাঝামাঝি অবস্থায়;
জাগৃতির কল্পনা আর স্থিতির স্বপ্নের মাঝে
সীমারেখা ছিল অস্পষ্ট।
চাঁদের আলো আঁধারে তলিয়ে-বাঁওয়ার সংগে
আমার চেতনা ডুবে গিয়েছিল অচেতনের অতলে,
ধীরে-ধীরে কখন কেটে গেছে নিজের তমসা—
ঘুম-ভাঙানে, প্রাণ-জাগানে আলোর আগরঙ্গী পরশে।
সহসা চমকে উঠল আলো যেন শিহর-লাগানো ছোঁয়ায়,
খুলির আবেগে দোলা লাগল বাতাসে,
ফুলের মৌরভ কোথা হতে পেল নোতুন মাদনা ?
পাখীর গলায় কে ঢেলে দিল এমন উত্তল সুর ?
চেয়ে দেখি, তুমি এসেছ,
এসেছ সব সংশয় চুকিয়ে-দিয়ে;
তোমার আগার সংগে-সংগে নোতুন হয়ে এল সারা সৃষ্টি,
সত্য হয়ে উঠল প্রাণ-মিথো-হয়ে-আগা জীবন,
হেলাফেলায়-ছড়ানো এলোমেলো নিজেকে পেলুম ফিরে,
নোতুন করে বুঝলুম তোমার মূল্য :
তোমায় দিয়ে পেলুম আমাকে,
আমায় দিয়ে তোমাকে।



মার্কিন শিক্ষাপদ্ধতিতে উপদেশ ও পরামর্শের স্থান

আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক বলেছেন—শুধু মাত্র পার্শ্ববর্তী সম্পদের পরিমাণ দিয়ে নয়, ব্যক্তির মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধনের কি কি সুযোগ আছে—তাই দিয়েই যে কোনও দেশের সভ্যতার পরিমাপ হওয়া উচিত।

আমেরিকার পাল্লিক স্কুলসমূহে ছাত্রদের বৃত্তি নির্বাচন ও অভ্যাস বিষয়ে যে পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়া হয়, উল্লিখিত কথাগুলির মধ্যে তার সারমর্ম নিহিত আছে। ছাত্রদের যোগ্যতা ও শক্তিসামর্থ্য যাতে পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করতে পারে, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই সকল উপদেশ দেওয়া হয়। বৃত্তি নির্বাচন, স্বাস্থ্যরক্ষা, মানসিক উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি বিষয়েই উপদেশ ও পরামর্শাদি প্রদান করা হয়।

আমেরিকার স্কুলের ছাত্রদের যে যে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে, বৃত্তি নির্বাচন সংক্রান্ত পরামর্শ তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সম্বন্ধে মূল কথা হচ্ছে—কোনও বৃত্তি কারও ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিচার বিবেচনা করে নিজেই নিজের বৃত্তি নির্বাচন করবে। নিজের শক্তিসামর্থ্য ও যোগ্যতা কতদূর এবং কোন বৃত্তি গ্রহণ তার পক্ষে সমীচীন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই তা ঠিক করবে।

যাতে ছাত্রেরা নিজেরাই নিজেদের ভাবী বৃত্তি নির্বাচন করতে পারে এবং গোড়া থেকেই তার জন্ম তৈরী হতে পারে সেজন্য প্রাথমিক পর্যায়ের স্কুল থেকেই এ সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান শুরু হয় এবং তখন থেকেই তার শারীরিক যোগ্যতা ও স্বাস্থ্য, মানসিক বৃত্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ, ব্যক্তিত্ব, পারিবারিক পরিবেশ প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়। হাই স্কুলেও এ সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ

করা হয় এবং যখন ছাত্রেরা চূড়ান্তভাবে স্ব স্ব বৃত্তি নির্বাচনের জগৎ প্রস্তুত হয়, তখন ঐ সকল বিবরণ থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। দেশে কত বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম আছে তার পরিচয়ও ছাত্রদের প্রাথমিক বিদ্যালয়েই দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে অধিকতর ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট ভাবে এ সকল বিষয়ে উপদেশাদি দেওয়া হয়। একজন বারী বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাদের নিকট থেকে ছাত্রেরা পরামর্শ পেয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টাবৃন্দ বিভিন্ন বাণিজ্য ও কর্ম বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে থাকেন। কোন ছাত্রের কোনদিকে ঝোঁক, কার বিদ্যাবুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব কি রকম, মাঝে মাঝে তার পরীক্ষা চলে এবং পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হয়। হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যে সময়ে কলেজে অথবা চাকুরীক্ষেত্রে প্রবেশের জন্ত প্রস্তুত হয়, সে সময়ে এই সকল বিবরণ থেকে কার কোন বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত তা একরকম পরিষ্কারই বোঝা যায়। শুধু স্কুলেই না, আমেরিকার কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়েও উল্লিখিত উপদেশ ও পরামর্শাদি প্রদান করা হয়।

শুধু বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারেই নয়, সাম্প্রতিক কালে আরও অনেক বিষয়ে এতৎসংক্রান্ত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেছে। পৃথক পৃথকভাবে ব্যক্তির উপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার ফলে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে কোন ছাত্রের কোনদিকে ঝোঁক, তা লক্ষ্য করে সেই অস্থায়ী তাকে পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্রদের উপদেশ ও পরামর্শদানের গুরুত্ব সম্বন্ধেও ক্রমশঃ সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটছে। সহরের বড় বড় স্কুলে এ জন্ম বিশেষ উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। তাদের (শেষাংশ ৮৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

চা বাগানের প্রাথমিক শিক্ষা ও বিবিধ সমস্যা

সচিদানন্দ

চা বাগানের প্রাথমিক শিক্ষা বা শিক্ষকগণের কার্যাবলি ও শ্রমিকদের সজ্ঞানসজ্জতির শিক্ষা সম্বন্ধে যদি জনসাধারণ আগ্রহশীল না হন তবে উহাদের উন্নতি সূচুর পরাহত। অধিবাসীদের অনেকটা আটক বন্দীদের (Internee) সহিত তুলনা করা চলে। কারণ যে মুষ্টিমেয় কেরাণীকুল দিনরাত সমানভাবে কাজ করিয়া বান বহির্জগতের সহিত তাঁহাদের মেলামেশা খুব কমই হয়।

সপ্তাহে এক দিন ছুটি। কোন কোন বাগান হইতে হাট বা বাজার ৫-৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ৩-৭ দিনের জিনিষপত্র ঐ একদিনেই কিনিয়া রাখিতে হয়। তারপর দিনরাত্র শ্রমিকদের সহিত চলাফেরা করিতে করিতে তাঁহারা তাহাদের নিজের বৈশিষ্ট্যও হারাষ্টয়া ফেলেন। তাঁহাদের অবস্থা তখন হয় 'না ঘরকা—না ঘাটকা।'

বিশ্বশালী যে সব কেরাণী বোর্ডিং বা অপর বায়গার তাহাদের ছেলেমেয়েদের রাখিয়া পড়াইতে পারেন—লেখা পড়া কিছুটা হয়ত তাহাদের হয়। হয়ত বলার অর্থ আমার এই ১০ বছরের অভিজ্ঞতা হইতে কাহাকেও আমি ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে দেখি নাই—তবে হয়ত দু-একটা ব্যতিক্রমও যে না আছে তাহা নয়। ইহা কি চা বাগানের অভিশাপ না আবেষ্টনের ফল? কাজেই প্রাথমিক শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার সরকার নিজ হাতে না নিলে উহাদের লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমাদের যতদূর মনে হয় বঙ্গীয় সরকার নিম্নলিখিত ভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে ভাগ করিয়াছেন :

- ১। সহরের (মিউনিসিপাল এলেকা) প্রাথমিক শিক্ষা।
- ২। গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা।
- ৩। শিল্পাঙ্গলের (চা বাগান ব্যতীত) প্রাথমিক শিক্ষা।
- ৪। চা বাগানের প্রাথমিক শিক্ষা।

প্রথম তিনটির সহিত আমার বিশেষ কোন সম্পর্ক না থাকায় চতুর্থটি লইয়াই আলোচনা করিব; কেননা ডুমাস

অঞ্চলের কোন চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি উহাই বর্ণনা করিব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক বাগানকে 'একরেজ' (acreage) ও কুলি লাইনের অবস্থানের চরম অনুযায়ী একটি কি দুইটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হয়। প্রায় প্রত্যেক বাগানেই এই প্রকারের দু-একটা বিদ্যালয় আছে। চা বাগানের মালিকগণ—ভারতীয় কি অভ্যন্তরীণ—বিদ্যালয় ঘর তৈরী করিয়াই খালাশ। উহার জন্ত যে আসবাবপত্রের প্রয়োজন যথা, টেবিল, বেঞ্চ প্রভৃতি তাহার কথা কেহই ভাবিয়াও দেখেন না। ভাবিলেও দিবার নাম করেন না। শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা তো পরের কথা। বলিলে বলেন,—“উহা সরকার বাহাদুরের দিবার কথা, আমরা শিক্ষক...”

শিক্ষকের বেতন ও স্কুল খর প্রভৃতি দিয়াছি বা দিতেছি। আমরা ব্যবসায় করিতে আসিয়াছি।” বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের মন্দ বলা যায় না তবে আমাদের মতে যে-সব সংস্থা জনসমষ্টির একটা বৃহৎ অংশ যে কোন লাভজনক কাজে নিয়োগ করে সেই সংস্থা তাহাদের মঙ্গলায়ঙ্গলের জন্ত অনেকাংশে দায়ী।

চা বাগানগুলি আবার দুই রকমভাবে পরিচালিত হয়, যেমন, ১। কোম্পানী কর্তৃক (Managed by Managing Agents) পরিচালিত; ২। ব্যক্তিগত (Proprietary) সম্পত্তি। ডুমাস অঞ্চলের বাগানগুলির বেশীর ভাগই ইউরোপীয় মালিকদের কর্তৃত্বাধীন। এই সকল বাগানে প্রাথমিক শিক্ষকদের যে কত প্রকার হীনতা হীনতার মধ্যে কাজ করিতে হয় তাহা আমি একে একে বর্ণনা করিব।

প্রথমতঃ, এই সব বাগানে যখন কোন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় তখন তাহাকে বলা হয় যে শুধু বিদ্যালয়ের কাজ লইয়া থাকিলে চলিবে না—অবসর সময়ে—সকালে ও বৈকালে অর্থাৎ স্কুলের সময় বাদ দিয়া তাহাকে অফিসে কাজ করিতে হইবে। অবশ্য সব বাগানের ম্যানেজারই

যে এই চুক্তি করেন তাহা নহে তবে বেশীর ভাগই এই চুক্তি করিয়া নেন। শিক্ষকরাও ভবিষ্যতের উন্নতির আশায় দেখেন যে ইহাতে আপত্তির কিছুই নাই, কারণ যদি অফিসের কাজ শিক্ষা করিতে পারেন তবে যখন কোন পদ খালি হইবে তখন জ্বলন্ত কাজ ত্যাগ করিয়া ঐ পদে যোগদান করিতে পারিবেন। জেলাবোর্ড যে বেতন দেন উহা হইতে একজন দারোগার বেতন বেশী। তারপর চা বাগানে শিক্ষকের বে পদমর্যাদা উহা হইতে একজন শিক্ষানবিশ (apprentice) কেরানীর পদমর্যাদা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা অনেক বেশী। এই সব কারণেই শিক্ষকেরা অফিসের কাজ করিতে বিশেষ উৎসুক হন।

বাগান হইতে শিক্ষকদের বোর্ডের বেতন বাদে পূর্বে ১০—১৫ টাকা পর্যন্ত সাহায্য দেওয়া হইত, তখন বোর্ড দিতেন ট্রেন্ড ম্যাটিকদের ১৬, ট্রেণ্ড নন ম্যাটিক ও ম্যাটিক ১২ এবং আনট্রেণ্ড নন ম্যাটিক ৮। কিন্তু বর্তমানে বোর্ড হইতে ‘ক’ শ্রেণীর শিক্ষক ৪৬।০ (মাগগিভাতা সহ) ‘খ’ শ্রেণী ৩৮।০ (মাগগিভাতা সহ) পান। ‘গ’ শ্রেণীর শিক্ষক চা বাগানে না থাকায় তাঁহাদের সম্বন্ধে এ বিষয় আমি বিশেষ কোন আলোচনা করিলাম না। ইহার উপর প্রধান শিক্ষকগণ ৫ টাকা করিয়া অতিরিক্ত ভাতা পাইতেছেন। ইউরোপীয় পরিচালিত বাগান ১৯৪৭ সাল হইতে শিক্ষকদের বেতন ধার্য করিয়াছে ৫০ টাকা ও মাগগিভাতা ৩৫ টাকা।

পূর্বে কোন কোন বাগান শিক্ষকদের চাকরের ভাতাও ২২ টাকা করিয়া দিত। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারী নহে এই অজুহাতে ১৯৪৮ সাল হইতে অনেক শিক্ষক এই চাকরের ভাতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অথচ কোম্পানীর নিয়মালুধারী শিক্ষকগণ উহা পাইবার অধিকারী, কারণ শিক্ষকদের Provident Fund আছে এবং কোম্পানীর কর্মচারী ব্যতীত কেহই Provident Fundএর সুযোগ সুবিধা পাইতে পারেন না। উক্তন কর্মচারীর নিকট ইহার বিরুদ্ধে আপীল করিলে স্থানীয় কর্মচারীরা সে দরখাস্ত পাঠাইতে অস্বীকার করেন। এই হইল ইউরোপীয় পরিচালিত বাগানের শিক্ষকদের অবস্থা।

ভারতীয় মালিক পরিচালিত বাগান শিক্ষকদের ইচ্ছামত বেতন দেয়। তাহার কোন নিয়মের ধারও থাকে না, তাহাদের বাগানে Provident Fundও নাই। এই সকল কারণে অবসর সময়ে officeএর কাজ শিক্ষা করিয়া যদি কোন শিক্ষক অফিসে চুক্তিতে এবং সম্মান ও অর্থের স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারেন তবে কেনই বা সে সুযোগ গ্রহণ করিবেন না? বিশেষতঃ বোর্ড হইতে ভবিষ্যতে যখন উন্নতির কোন আশাই নাই এবং ছেলেমেয়েদেরও মুখ করিয়া রাখা ভিন্ন যখন অন্য কোন উপায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল শিক্ষক এই সব সুবিধা পান না তাহারা যদি অফিসে কাজ করিতে অস্বীকার

(৭৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পূবে হাওরা মাঠ পেরিয়ে
যেমন পড়ল আসি
বাঁশ বাগানে সোঁ সোঁ করে বাজিয়ে দিয়ে বাঁশি,
অমনি দেখে মা চেয়ে
সকল মাটি ছেয়ে
কোথা থেকে উঠলো যে ফুল
এত রাশি রাশি।
তুই যে ভাবিস ওরা কেবল
অমনি ঘেঁষ ফুল,
আমার মনে হয় মা তোদের

সেটা ভাবি ফুল।
ওরা সব ইঁদুলের ছেলে,
পুঁথি পত্র কাঁখে
মাটির নীচে ওরা ওদের
পাঠশালাতে থাকে।

বিশের চির নূতন ও চির পুরাতন শিশুদের মনের মাঝে
যে সমস্ত ভাবের অধিব্যক্তি হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
তাঁহার নিপুণ কাব্যভূষিকার দ্বারা এইভাবে একটীর পর
একটী তাহার ছবি অঙ্কিত করিয়া আমাদের এক অপূর্ব চিত্র-
গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন।

করেন তবে তাঁদের সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা বন্ধ করিয়া দিবার ভয় দেখান হয়। যে হতভাগ্য শিক্ষক একবার অফিসের কাছে যোগদান করিয়াছে তাহাকে বিনা পারিশ্রমিকে বছরের পর বছর ঐ কাজ করিয়া যাইতে হয়। অথচ অবসর সময়ে অল্প কাজ করিতে পারিলে হয়ত তাহার কিছু আর্থিক সাহায্য হইত। কার্যক্ষেত্রে দেখাও গিয়াছে যে কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার কোন কোন শিক্ষককে হয় কাজে ইস্তফা দিতে হইয়াছে না হয় তাহাকে তাড়াইবার জন্য কর্তৃপক্ষ “কমিউনিষ্ট” আখ্যা দিয়া বোর্ডের নিকট চিঠি দিয়া উত্থাপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এ বিষয় বোর্ডের কর্তৃপক্ষকে বলিলে তাহারা বলেন—“ম্যানেজারের সহিত ঝগড়া করিয়া বাগানে কাজ করিতে পারিবেন না। যা বলে করিয়া যান। আর যদি বোর্ডের টাকার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারেন, তবে বোর্ড অফিসের কাজ বন্ধ করিয়া দিতে পারে।” কথা সত্যিই। বোর্ডের সামান্য টাকায় একজন উপার্জনক্ষম লোকের পক্ষে ৫০ জন লোকের সংসার যাত্রা নির্বাহ করান সম্ভব নয়। বাগানে ম্যানেজারই সর্বেসর্ব্বা, শিক্ষকদের স্বার্থ রক্ষা করার অল্প কেহই নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া শিক্ষকদের অবিচার, অভ্যাসের সহ্য করিয়া মুখ বুজিয়া কাজ করিয়া যাইতে হয়। কেরানীকুলও পরিষ্কারের লাভবান হয় বলিয়া শিক্ষকদের পক্ষ হইয়া কিছুই বলেন না।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিক শ্রেণী খুবই দরিদ্র—উহারা যে বেতন পায় তাহা দ্বারা নিজেদেরই ভরণপোষণ করিতে পারে না ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখান ত পরের কথা। কাজেই বাধ্য হইয়া ছেলেমেয়েদের কাজে পাঠাইতে হয়। এই প্রকারে বাপ, মা, ভাই, বোনদের মিলিত আয়দ্বারা তাহারা কোনমতে তাহাদের সংসার-যাত্রা নির্বাহ করে। তাঁদের দারিদ্র্যের জন্য “হাড়িয়া” নামক তরল পদার্থ টা অবশ্যই দায়ী। এই ‘হাড়িয়া’ হইল পচাইয়ের রূপান্তর। এই ধাত্তেয়ীর রূপায় তাহারা তাহাদের দরিদ্র জীবনযাপন করিতে বিশেষ কষ্টাশ্রম করে না, কিন্তু কৌমল্যমতি শিশুদের ভবিষ্যৎ কীটনষ্ট ফুলের মত করিয়া ছাড়িয়া দেয়। জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই এদের এই পচাই খাওয়াইতে আরম্ভ করে, কাজেই একটু বয়স হইলে তাহারা আর এ অভ্যাস ত্যাগ

করিতে পারে না। ছেলেমেয়েরা একবার পয়সার ও “হাড়িয়ার” আবাদ পাইলে আর স্থলে আসিতে চায় না। স্থলে সাজসরঞ্জাম থাকিলে সে আকর্ষণে হয়ত আসিত কিন্তু মক্কাবুর মত রক্ষা যে-সব স্থল সেখানে অ, আ, ক, খ, পড়িতে মন চাহিবে কেন? বিশেষতঃ সপ্তাহ অন্তে যখন তিন চার টাকা করিয়া তাহাদের উপার্জন হয়। অভিভাবকরাও তখন এই আয় হইতে সহজে নিজেদের বঞ্চিত করিতে চায় না।

অনেক কষ্টে যদিও অভিভাবকদের ছেলেদের স্থলে পাঠাইতে রাজি করান গেল—ছেলেরাও হয়ত নিয়মিত স্থলে আসিতে আরম্ভ করিল কিন্তু কিছুদিন পরে আবার দেখা গেল যে ছেলেরা স্থলে আসা বন্ধ করিয়াছে। খোঁজ নিয়া জানা গেল বাগানে ঠিক মত কাজ না করার জন্য তাহাদের রেশন বন্ধ—কাজেই কি করিয়া তাহারা স্থলে আসিবে। বাপ, মাও লেখাপড়ার মর্যাদা না জানায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে চায় না, কাজেই তাহাদের তাড়নায় তাহাকে পুনরায় বাগানে যাইতে হয়। ফলে একদিন যে ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিল নিয়মিত স্থলে না আসায় ও পরীক্ষার সময় উপস্থিত না হওয়ায়, সে আর উপরের শ্রেণীতে উঠিতে পারিল না। এমন করিয়াই শিশুদের সময় বছরের পর বছর নষ্ট হইয়া যায় এবং রাষ্ট্রের বোঝাও দিন দিন বাড়িয়া চলে।

শিক্ষক মহাশয়ের অহুরোধে কোন কোন বাগানের ম্যানেজার হয়ত ছেলেদের একবেলা কাজ ও একবেলা স্থলে বাইবার আদেশ দেন। উহাতে এই ফল হয় যে যেদিন কাজে গেল সেইদিন স্থলে আসিতে বাধ্য হইল—যেদিন গেল না সেদিন স্থল কামাই করিল কারণ সে জানে যে স্থলে গেলেও সে হাজরি পাইবে না। তাহার পরিবর্তে সে গুল্ফি লইয়া পাখী শিকার করিতে বাহির হইল। ছেলেদের স্থলে আসার উদ্দেশ্য লেখাপড়া শেখা বা রুচির পরিবর্তন নয়—কোনক্রমে হাজরি পাওয়া, শিকার জন্য আগ্রহ যেমন অভিভাবকের নাই তেমনি নাই ছেলেদের। চরিত্রহীনতা—অশ্লীল আলাপ, আলোচনা ইহাই চা বাগানের নরুপ। তাহারা পরিকারই বলে “লেখাপড়া শিখিয়া” কি হইবে—পয়সা পাওয়া যাবে না, বাগানে গেলে পয়সা পাবে।”

কোন কোন অতিভাবক শিক্ষক মহাশয়দের নিকট আসিয়া ছেলেদের নাম কাটাইয়া দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। শিক্ষক মহাশয় তাহাদের বুঝাইয়াও একাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন না। শিক্ষকদের রাজী করিতে না পারিলে তাহারা ছেলেদের বাগানের কাজে না পাঠাইয়া কোনও লোকের ব্যক্তিগত কাজে অর্থাৎ কাহারও গরু বা মহিষ চরাইবার কাজে নিযুক্ত করিয়া দেয়। উহাতে তাহার বাগানের কাজে বাইতে হইল না—অথচ স্থলে অল্পপস্থিত থাকার জন্য হাজিরও বন্ধ হইল না—খাণ্ডেরও অভাব হইল না আবার খান্ড ও কিছু বেতন, গরু বা মহিষের মালিকের নিকট হইতে পাইল। এই তো গেল ছাত্র অল্পপস্থিতির কারণের এক দিক। অপর দিক হইল অভাবজনিত, বই, প্লেট প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিষের অভাব। পীড়াপীড়ি করিয়া বলিলেও অতিভাবকরা বই কিনিয়া দেয় না। শ্রমিকদের মেয়েরা তো স্থলে আসেই না। খোজ নিয়া দেখা গেল যে বাপ মায়ের ইচ্ছা নয় যে তারা স্থলে আসুক। বুঝাইলেও তাহারা বোঝে না।

চতুর্থতঃ, বোর্ডের নিয়ম অনুসৃতঃ পক্ষে গড়ে ২০ জন ছাত্র দৈনিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকিলে স্থল বন্ধ হইয়া বাইবে। যে সব বাগানে উল্লিখিত ছাত্রসংখ্যা উপস্থিত থাকে না অথচ স্থল নিয়মিতভাবে চলে উপরোক্ত ছাত্রসংখ্যা উপস্থিত না থাকায় বোর্ড সেখানকার শিক্ষক মহাশয়ের বেতন আটক করিয়া রাখেন। যেন ছাত্রদের অল্পপস্থিতির জন্য শিক্ষক মহাশয়ই দায়ী। ছাত্রদের অল্পপস্থিতির জন্য বোর্ডের উচিত ম্যানেজারের নিকট পত্র লেখা এবং সেজন্য ম্যানেজারের কৈফিয়ৎ লওয়া। কিন্তু অবস্থা হয় উল্টা বুঝি। রাম। বেচারী শিক্ষক। ২১৩ মাস পর্যন্ত হয়ত তার বেতন বাকীই থাকিল। পরে উপদেশ মত মিথ্যা উপস্থিতির সংখ্যা দেখাইয়া নিয়মিত বেতন পাইতে লাগিল। চুঃখের কথা বোর্ড একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন না এই ভাবে বেতন বন্ধ রাখার কি ফল হয়। লেখালেখি করিয়া আটক টাকা পাইতে বছর শেষ হইয়া যায়। শিক্ষকেরা যখন দেখেন প্রকৃত অবস্থা লিখিয়া শাস্তি পাইতে হয় এবং আর্থিক কষ্ট সহ্য করিতে হয় তখন মনে করেন নিরুদ্বেগে যাহা করা যায় তাহাই

ভাল। ফলে, শিক্ষকদের মধ্যে মিথ্যা ও প্রবন্ধনার প্রলোভন বাড়িয়া চলে।

“ডুয়ার্স চা বাগান ভারতীয় কর্মচারী সমিতি” (Dooars Tea Garden Indian Employees' Association) নামে একটি সমিতি আছে। এই সমিতি “ভারতীয় চা বাগান পরিচালক সমিতি—ডুয়ার্স শাখা”র সহিত লেখালেখি করিয়া বোর্ডকে বাগানের শিক্ষকদের বাগানের কর্মচারী বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বলা হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া গেল আজ পর্যন্ত এ বিষয়ের কি হইল তাহা কিছুই জানিতে পারা গেল না।

যদি চা বাগানের শিক্ষকগণকে পূর্বঘোষণা স্থানীয় পরিচালক সংস্থার উপর ছাড়িয়া দিতে না চান তবে পূর্ণ মর্যাদায় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত করুন। তাহারা তো রেলওয়ের, টাটার ও কয়লার খনি প্রভৃতির প্রাথমিক স্কুলগুলি স্থানীয় পরিচালকমণ্ডলীর উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখানেও কি বাগানের দেয় শিক্ষা-কর grant-in-aid হিসাবে বাগানের কর্তৃপক্ষকে দিয়া নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়া তাহাদের উপর বিদ্যালয়গুলির পরিচালন দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে পারেন না? তাহা হইলে আংশিক বেতন, জালানি কাট, বাসা প্রভৃতির জন্য ম্যানেজারদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিয়া শিক্ষকদের আত্মমর্যাদা হারা হইতে হয় না। তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাগানের কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইয়া কর্মচারীদের সকল সুখ সুবিধা পাইতে পারেন।

সরকার যদি ইহাতেও অসম্মত হন, তবে ফ্যাক্টরী কর্মচারীদের যেমন বাগানের কর্মচারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন শিক্ষকদের বেলায়ও তাহা করুন। ম্যানেজারদের উপর শ্রমিকদের সম্মানদের শিক্ষার জন্য আধুনিকতম শিক্ষার উপযোগী বস্ত্রপাতিসহ বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ দিন। যদি প্রয়োজন হয় এজন্য শিক্ষা সংক্রান্ত আইনেরও সংশোধন করিতে হইবে। ম্যানেজারগণও তাহা হইলে শ্রমিকদের সম্মানদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতে বাধ্য হইবেন এবং সরকারও ইহাতে উপকৃত

(শেষাংশ ৯০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পল্লীশিক্ষার সাহিত্য সাধনা

অসহ্য দুঃখকষ্ট এবং শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও বাংলার চির উপেক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকগণের হৃদয়ে রসের উৎস শুষ্ক হয় নাই। এই সকল শিক্ষককে সাহিত্য সাধনায় নূতন উৎসাহে উদ্বীপিত করিবার জন্য এই বিভাগে তাঁহাদের লেখা ছাপা হইয়া থাকে। স্থানাভাববশতঃ সকলের লেখা ছাপান সম্ভবপর না হইলে অথবা ছাপাইতে দেয়া হইলে শিক্ষকগণ যেন দুঃখিত না হন।

অধ্যাত পল্লী শিক্ষকগণের রচনা বলিয়া কেহ এগুলি উপেক্ষা করিবেন না। এ বিভাগের লেখা খ্যাতনামা লেখকদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে।

দেবতত্ত্ব

(নক্সা)

শ্রীগোপীকৃষ্ণ মণ্ডল

নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ব্রাহ্মণগণ মূনিবর সৌতিকে বলিলেন,—“হে ব্রহ্মবেত্তা ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ, ইহার পর দেবতাদের সমাজ পরিচালনার কথা বর্ণনা করুন—বাহা জ্ঞাপন করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া জীবের অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়।”

অতঃপর সৌতি বলিলেন, “হে মূনিগণ জ্ঞাপন কর। দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া সহস্রলোচন ইন্দ্রকে রাজ্য নিরূপিত করিলেন এবং শাসনকার্য্য সুপরিচালনার নিমিত্ত সমাজকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন। যথা :— আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। ইহাদের কোন ব্যবস্থাপক সভা পরিষদ ছিল না বলিয়া নূতন কোন নিয়ম প্রবর্তন করিবার উপায়ও ছিল না। বিধি পদ্ধতিগণি যে সমস্ত বিধান দিয়াছিলেন, তাহাই অপরিবর্তনীয় ভাবে চলিয়া আসিতেছে। তিনিই সকল দেবতার কার্য্যভার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেহ তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। বরুণদেব সেচ বিভাগের মন্ত্রী মনোনীত হইলেন। মহাদেব আবগারী সচিব হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই দপ্তরের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইত বলিয়া তিনি গদিচ্যুত হইয়াছেন। ফলে তাঁহাকে এখন স্থূলি লইয়া ঘারে ঘারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয়। ধনুস্তরী স্বাস্থ্যমন্ত্রীরূপে বহাল হইলেন। কেহ কেহ বলে

অশ্বিনীকুমার দুইজনই স্বাস্থ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পমানে যতদূর মনে হয় তাঁহারা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারী কি ডেপুটি মিনিষ্টার হইয়াছিলেন। দেব সেনাপতি কার্তিকেয় যুদ্ধ বিভাগের ভার পাইলেন। ইন্দ্র রাজা হইয়াও বিদ্যাৎ সরস্বতাহের কাজটা হাতছাড়া করেন নাই। অমর শ্রীকৃষ্ণ প্রধান মন্ত্রীর পদটা বাছিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বটি নিজের হাতেই রাখিয়াছিলেন। তবে খাদ্য বণ্টনে পক্ষপাতিত্বের জন্য চারিদিকে যে রকম বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় তিনি একদিন বিরক্ত হইয়া মাহুঘের হাতে বিভাগটি ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। যদিও ইহার পর একদল কুটনৈতিক বুদ্ধিমান লোক রেশন পদ্ধতিতে রোজমাপার ব্যবস্থা করিবে তবুও এই বিভাগটির সুনাম অর্জন করা মুশ্কিল হইয়া পড়াইবে।

বাহা হউক, তাহা হইলে তোমরা দেখিতেছ যে, স্বর্গে কোন কোন মন্ত্রী একাধিক দপ্তরের কাজ চালাইতেন। অবশ্য এই নিয়মটা ভারতের সর্বত্র চালু হইতে এখনও দেয়া আছে। জনগণ যখন গণেশের পূজা করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে, তখন এই দেশের দপ্তরদারীরা এই

নিয়মটি বহুদিন বহাল রাখিতে সচেষ্ট হইবে। কারণ ভারতের অধিবাসীরা ভারতের দর্শনগত কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের কথা নতুন করিয়া স্বরণ করিবে। ইহার পূর্বে ইংরাজ প্রভুদের দাসত্ব করিবার ফলে সমস্ত অতীতকে তাহারা ভুলিয়া থাকিবে। তবে সংস্কারপন্থী বলিয়া এক প্রকার জীব জন্মগ্রহণ করিতে পারে তাহারা বিপুল মাথা ও বিরাট হস্ত নাড়িয়া ইহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিবে।

“অন্যান্ত বিভাগের মধ্যে গণপতিক বাণিজ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইল। তবে ইহার মাঝে মাঝে ভুল ক্রটির নিমিত্ত ইহাকে গদিছাড়া না করিতে পারিলেও কেহ কেহ গণেশ উটাইতে ছাড়িত না। গুরুদেব বৃহস্পতি সর্বসম্মতিক্রমে শিক্ষামন্ত্রীপদে নির্বাচিত হইলেন। নারদকে রাষ্ট্রদূত করিয়া দেওয়া হইল; কারণ সব রাষ্ট্রেরই অলিগলির খবর তাঁহার জানা আছে। পরিশেষে “ট্যাকশালটী” বসান হইল। কুবেরের বৈঠকখানায়।

“এইবার আমরা বিচার বিভাগের কথা আলোচনা করিব। বিচারের বাবিতীয় কাজ ঘরের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তিনি আপন দলীয় ব্যক্তিদের বিভিন্ন সরকারী কাজে নিয়োগ করিলেন। বিধাতৃ-পুরুষ আজও তাঁহার নাজিরের পদে বহাল আছেন। তবে জেলখানাটা কেন যে নরককুণ্ডে স্থাপিত করা হইয়াছে তাহা সঠিক বলিতে পারিব না, দেবকুণ্ড নামে কোন কারাগার নির্মাণ করা হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়। ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা যে নরককুণ্ডে নরলোকের জীব ব্যতীত দেবতাদের শাস্তির কোনও ব্যবস্থা নাই। গুরুদেব বেদব্যাস বলিয়াছেন দেবতার বাহা করিবেন তাহা সবই দেবলীলা বলিয়া স্বীকৃত হইবে। তবে যদি নিতান্ত অজ্ঞান বলিয়া কিছু করিয়া বসেন, তাহা নিজেদের মধ্যেই চাপা থাকিবে, কাগজের মারফৎ প্রচার করা সম্ভব হইবে না। কারণ খবরের কাগজের প্রচলন হইবে অনেক পরে, আধুনিক যুগে। সত্য, ত্রেতা, ষাণ্ময়, কলি—তাহার পরের যুগ আধুনিক যুগ।”

শৌনক বলিলেন—হে মুনিবর, আমরা ত কোথাও

পাঁচটা যুগের কথা শুনি নাই। আপনি কি বলিতেছেন, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

তখন সৌতি বলিলেন, আহা এই ছোট কথাটি বুঝিলে না? ইহাই ত কালের ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম না থাকিলে যেমন ব্যাকরণের সূত্র অচল, তেমনি। তোমরা সকলে নিশ্চয়ই জান, সত্যযুগের পর ষাণ্ময়ের আগমন—ইহাই স্থির হইয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসরাজ রাবণ এমনই দুর্দান্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে দমন করিতে যুগের ও পরিবর্তন করিতে হইল। কালপূর্ণ না হইলে তাঁহার নিধন অসম্ভব। ফলে, ষাণ্ময়কে একপা পিছাইয়া দেওয়া হইল, ত্রেতা, সত্যযুগের পরে আসিল। বুঝিলে ত এইবার। আবার দেখ, বেদ বলিতে চারিটি বুঝায় কিন্তু মহাভারতটি গুরুদেবের লেখা হইলেও আধুনিক যুগে পঞ্চমবেদরূপে গণ্য হইবে। সে যুগের লোকেরা এই আধুনিক-বেদব্যাসের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার করিবেনা। তবে তাঁহার করিত্বকে আদর ও অঙ্গস্বরণ করিলেও তাঁহার প্রচারিত আচার ব্যবহার অঙ্গকরণ করিতে চাহিবে না।

“শিক্ষা মন্ত্রী গুরুদেব জন্মকণ হইতেই যোগ সাধনার বলে ত্রিগুণাতীত গুণ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারীকালের উত্তরাধিকারী অর্থাৎ ঐ আধুনিক যুগের পণ্ডিত সমাজ ছাত্রদের যোগশিক্ষার পরেই বিয়োগ শিক্ষা দিবেন। একই সংখ্যাকে পর পর যোগ করিয়া যোগফলে যে গুণফল পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারা অঙ্গস্বরণ করিবেন না। যোগ বিয়োগ, গুণ অতিক্রম করিয়া ভাগ করিতে বসিবেন, খাবার ভাগ, জমিভাগ, ধানভাগ এমন কি শেষে দেশভাগ করিতে ও তাঁহারা কুষ্ঠা বোধ করিবেন না। যোগ সাধনা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইবেন। আর ও বলিয়া রাখি, ঐ নব্যযুগে শিক্ষক নামে সমাজে এক নিকট শ্রেণীর জীবের সৃষ্টি হইবে। তাহারা এধানকার মত শিষ্যদের ঋশিক্ষা দিবে না। অর্ধ উপার্জনের নিমিত্ত বিদ্যা বিক্রয় করিবে, বিদ্যা দান করিবে না। সমাজে তাহাদের সম্মান থাকিবে না। ছাত্ররা গুরুমহাশয়কে যৎকিঞ্চিৎ ভয় করিবে কিন্তু ভক্তি করিতে জানিবে না। শিক্ষকের পক্ষপাতিত্ব

থাকিবে। ছাত্র মহলে তাহার নিম্না প্রচার হইবে। সরকার কিছু মাগ্গি ভাতা দিয়া তাহাদের মাথা কিনিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন।”

ভাবীকালের এই ভবিষ্যৎবাণী শ্রবণ করিয়া সকলে ভীত হইয়া বলিলেন, হে ঋষিগণ! আপনি এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া দেবতাদের কাহিনী আরম্ভ করুন। নূতন যুগের কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের মনে অত্যন্ত সংশয় উৎপন্ন হইতেছে।

সৌতি মূনিদের ভীত হইতে দেখিয়া পূর্বপ্রসঙ্গে কিরিয়া আসিলেন। সৌতি বলিতে লাগিলেন—

“বিভাগীয় মন্ত্রীদের কার্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া স্ব স্ব যানবাহনেরও ব্যবস্থা হইল। কেহ রথ পাইলেন, কেহ মহিষ পাইলেন, কেহ বাঁড় পাইলেন, কেহ পাখী পাইলেন, কেহ পাইলেন ঢেঁকি। এই ভাবে অমর-সমাজ সুপরিচালনার জন্ত নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ইন্দ্র নামে মাত্র রাজা। আসলে তিনি সাক্ষী-গোপাল। নাসিকায় সর্ষপ তৈল প্রদান পূর্বক অমরাবতীতে স্থখে নিদ্রা বান। ক্ষমতা তাঁহার খুবই সীমাবদ্ধ। পারিজাত হরণের সময়েই তাঁহার কর্তৃত্বের বিচার হইয়া গিয়াছে।

সৌতি বলিতে লাগিলেন—“দেখিতে দেখিতে এই শাসন ব্যবস্থায় স্বর্গের স্থখ সমৃদ্ধি বাড়িয়া উঠিল। নর, বানর বক্ষ, বক্ষ, কিয়র, গন্ধর্ব্ব, অসুর সকলেরই স্বর্গে বেড়াইতে বাইবার। কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া স্বর্গস্থ ভোগ করিয়া আসিবে। কেহ স্তবস্তুতি করিয়া, কেহ ধর্ম্মকর্মে পুণ্য অর্জন করিয়া, কেহ যজ্ঞতা স্থাপন করিয়া কেহ বা ভোষামোদ করিয়া স্বর্গবাস করিল; কিন্তু নিম্নশ্রেণী অসভ্য অসুরগণ ব্রহ্মাধিকার এবং স্বর্গরাজ্যের সীমানা লইয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিল। দেবতাদের স্থখ সমৃদ্ধি তাহাদের ধাতে সঙ্কট হইল না। তাহারা ও সমান অধিকার দাবী করিয়া বসিল। অপরদিকে দানবসংখ্যা হ্রাস করিয়া বাড়িয়া চলিল। ফলে পুনর্বার সেনার জন্তও সীমানা কিছু বাড়াইবার প্রয়োজন হইল। এই সঙ্গে বহুভাগেরও।

“অসুরদের গুরুদেব ছিলেন পণ্ডিত শুক্রাচার্য্য। সকলে মিলিয়া শুক্রাচার্য্যকে ধরিল উপায় বাৎলাইয়া দিতে।

শুক্রাচার্য্যের উদ্ভাবন ফলে দৈত্যগণ ‘যুদ্ধং দেহি’ বলিয়া সরাসরি অমরাবতীতে হানা দিল। ঋগ্বেদে হইল এই করিয়া। শুক্রাচার্য্যকেও বলি, তুমি না হয় বাপু হোস্তুকি চুমিয়া ধ্যান ধারণা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছ। কিন্তু এই স্থলবুদ্ধি অসুরগণ কখনও কি কুটনীতিতে দেবতাদের সংগে আঁটিয়া উঠিতে পারে? অমৃত পানের ফন্দিটি তাহাদের দেখাইয়া শেষে ফলটা কি হইল? বেচারী রাজকেতু চালাকি করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। ধরা পড়িয়া গেল শেষে। দেবতাদের বে কপালে আর একটা করিয়া চোখ রহিয়াছে। কাহার বারটা, কাহার পনরটা আবার কাহারও হাজারটা চোখ। তাহাদের চোখ এড়ান কি সহজ কথা। ব্যাটা চক্ষু স্বর্ঘ্য এখন গোয়েন্দাগিরির ফলভোগ করিতেছে। শুক্রাচার্য্য পণ্ডিত হইলে কি হইবে? নইলে তাঁহারই শিষ্য কিনা তাঁহার চোখ কান করিয়া দেয়।

শুনিবামাত্র শ্রোতৃবর্গ অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল—তাই নাকি! বলুন-বলুন, ইহার পর পাণিষ্ঠ অসুরগণ কি করিল? শুনিতে আমাদের বড়ই কৌতুহল জন্মিতেছে।

সৌতি বলিয়া চলিলেন। “অসুরগণ সমৃদ্ধ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিয়া তপস্শ্রা করিয়া ক্ষমতা অর্জন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা ও মহাদেব উভয়েই বেসামাল হইয়া বা’তা’ করিয়া বরদান করিতে লাগিলেন। অযোগ্য ব্যক্তিকে ক্ষমতা দিতে নাই, ছোটলোককে মাথায় তুলিতে নাই। ভূতকে কখনও স্বর্গপথ দেখাইতে নাই।

“ফলে ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যুদ্ধে দেবতাদের স্বর্গ হইতে শিশুলতুলার মত উড়াইয়া দিল। দৈত্যগণ স্বর্গরাজ্য দখল করিয়াও ক্ষান্ত হইল না। শতীদেবীকে দেখিয়া তাহাদের স্বর্গে ভূত চাপিল। “অভি অত্যন্তম-পহিতম।” এই রোগেই মরিল রক্তবীজ, করীজ্ঞানুর, বৃদ্ধাসুর, তায়কাসুর প্রভৃতি সকলে। কিন্তু মহিষাসুর নামে এক দুর্দান্ত দৈত্য ছিল। তাহাকে কোন দেবতাই কোন মতে কাবু করিতে না পারিয়া স্ত্রী গোয়েন্দা নিযুক্ত

করিলেন। মহিষ যন্ত চতুর অস্তুর ছিল। তাই সে দাবীতে উভয়পক্ষ হাত না মিলাইলে কাজ পাওয়া দ্রব্বর।
প্রথমটা রক্তচক্ষু দেখাইয়া শেষে বক্তৃতা স্বীকার করিয়া “বাহোক মহিষাসুর শাস্ত হইলে দেবতার হস্তরাজ্য
বজ্রভাগ আহার করিল। অধিকার কি সামান্য জিনিষ? পুনরায় কিরিয়া পাইলেন।
দিব বলিলেই দেওয়া হয় না, আবার লইব বলিলেই পাচ্ছে এই পর্যন্ত বলিয়া সৌতি সেদিনের মত পাত্ৰোখান
ফলের মত ছিড়িয়া গওয়া যায় না। ন্যায় করিলেন।

রবীন্দ্র-প্রয়াণে

ঈশ্বরদীর কুমার ভৌমিক

শাওন মেঘেতে ঢেকেছে আকাশ,
নেমেছে বাদল ধারা,
তটিনী বাঁধন হারা।

ধূ ধূ করে মাঠ—নাহি কোথা কেউ,
সঘনে কাদিছে সাগরের ঢেউ :
স্তম্ভ সমীর—বিরহ ব্যথায়

ধরণী কাদিয়া মরে,
কাননে কুসুম বরে।

এমনি দিবসে তুমি চলে গেছ

শেষ করি' তব গান—
কাদায়ে সবার প্রাণ।

ভাবিতে পারিনি—এমনি করিয়া

দূরে বাবে তুমি সহসা সরিয়া :
ছেল টানি ছায় জীবন ছন্দে

খেয়া দেবে পারাবারে,
ভাবি তাই বারে বারে।

মনে পড়ে কোন শুভক্ষিণে তুমি

আমাদের মাঝে আসি
বাজালে মিলন বাঁশি

তব কল্পনা বেক্ষপ দেখালে,

তোমার বীণায় যে গান শেখালে

মৃদু হৃদয় নিখিল ধরায়

কনক প্রদীপ জালি'
দানিল অর্থ্য-ভালি।

সোনার কাঠির পরশে তোমার

ঘুম হ'তে জাগি' সবে
হেরিছ নিখিল ভবে—

ঐশ্বর্য কালিমা বভেক টুটিয়া

স্বর্ণ অরুণ উঠেছে ফুটিয়া

মেলিয়া ধরেছে পরশে তাহার

কিরণ সমুজ্জল
হৃদয়ের শতদল।

তোমার 'বলাকা' নিয়ে গেছে সবে

অজানা অচিন' দেশে—

মেঘে মেঘে ভেসে ভেসে।

'মানসীতে' দূরে বেধেছিলে-বারে,

'চিত্রা'তে দেখি সবার মাঝারে :

'গীতাঞ্জলি'র গীত ঝংকারে

পরশি' নতুন স্বর

বেধেছ মোদের প্রেমের নিগড়ে

'ভারত-ভীষে' এক সাথে ক'রে,

তুমি চলে গেছ—তবুও বাঁধন

ছেড়ে নি আজিও কবি—

মোছে নি তোমার ছবি।

তুমি চ'লে গেছ—খেমে গেছে স্বর,

বেশ ভ্রমে আছে মনে,

স্মরি তাই ক্ষণে ক্ষণে।

কাছে নাই—তব কাছে আছ তুমি,

কবিতা-কুসুমে মন-আসি চুমি

দেহটি তোমার পেয়েছে বিলয়

আত্মা রয়েছে জাগি

মানব-মুক্তি লাগি'।

প্রাথমিক শিক্ষক

ক্রীনারায়ণচন্দ্র নায়ক

শিক্ষা-সাধনে কত সাধ আগে সাধ্য আমার কই ?

অতন্ত্র জেগে রই।

যতটুকু আলো আছে মোর মাঝে,

নিঃশেষে তাও দিতে পারি না যে—

দিনে দিনে আমি শিশু-মঙ্গলে জন-মঙ্গল চাই,—

প্রতিদান কই পাই।

ভোগ চাহিনাক', চাহিয়াছি শুধু বাঁচিবার অধিকার,

ফিরায়েছ বারে বার।

ক্লটির বদলে পেরেছি পাথর,

সুখার জ্বালায় হয়েছি কাতর,

সঙ্গতিহীন জীবনের জ্বের টানিতেছি দিন দিন

দীন বটে, তবু নহি দীন।

মোর সম্মুখে রেখে পৃথক্‌পৃথক্‌ ছুটে আসি পাঠাগারে

সব ভুলি বারে বারে।

কতু বিরতির অবসরে হায়

স্মৃতি-কোণ মোর চাকে কালোছাঁয়,

তবুও আশায় বাঁধিয়াছি বুক, ভুলেছি সব

শিশুদের কলরবে।

পনেরই আগষ্ট

শ্রীজিতেন ভৌমিক

রজনীর অন্ধকার হয়েছে বিলীন,

সমুদিত দিনমণি। সুবর্ণ প্রভার

সমুজ্জ্বল অদ্যকার পূণ্যময় দিন

পনেরই আগষ্ট। জগৎ সত্য

ত্রিভুজ পতাকাভলে জনগণ সবে

আনন্ত-মন্তকে রয়ে জানাতে প্রগতি—

মুক্তির বেদীর পরে সাহারা নীরবে

আত্মারে উৎসর্গ করি' আনিল মুকতি

পর্যায়ী এ ভারতে। সেই স্বাধীনতা

বহুকষ্টোজিত ধন, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা,

দলাদলি, অনিয়ম, অত্যাচার আসি'

নাহি যেন করে গ্রাস। আজি এ উৎসব

ভবেই সার্থক হবে যত গান, হাসি;

অক্ষয়, অম্লান হবে জাতির গৌরব।

(৭৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

মধ্যে থাকেন সাধারণ চিকিৎসক, দস্ত চিকিৎসক, মানসিক রোগ চিকিৎসক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজকর্মী এবং বৃত্তি-বিশেষজ্ঞ।

অবশ্য উপদেশাদি দানের ব্যাপারে শিক্ষকদের স্থান এখনো সর্বোচ্চে। যাতে তাঁরা ছাত্রদের যোগ্যতা ও প্রয়োজন সম্যকভাবে অনুধাবন করতে পারেন, এ জন্ত আজকাল সকল শিক্ষকেরই কিছু না কিছু মনস্তত্ত্বসংক্রান্ত শিক্ষালাভ করতে হয়। ফুলের ডাক্তার, নাগ বা দস্তরোগ-বিশেষজ্ঞগণ স্বাস্থ্য-

সংক্রান্ত পরামর্শাদি দিয়ে থাকেন। কোন কিছু বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হ'লে তাঁরা তাঁর প্রতিকারের উপদেশ দিয়ে থাকেন।

কোনও কোনও বিদ্যালয়ে মানসিক রোগ-বিশেষজ্ঞ এবং সমাজকর্মীরাও ছাত্রদের শিক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকেন এবং প্রয়োজন হলে ছাত্রদের বাড়ী গিয়ে তাঁদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেন। খুব অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও, যেখানে প্রবর্তন করা হয়েছে সেখানে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে।

জাতিগঠনের গুরু দায়িত্ব তোমার শিক্ষক ইহা ভুলিও না।

শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও যে ভ্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিও। দেশ ও জাতি একদিন তোমার ত্যাগের মহিমা বুঝিবেই। বিশ্বাস কর—সে দিন বহু দূরে নয়।



ইউরোপ যাত্রীর পত্র

শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী, এম-এ, পি-এইচ-ডি, এক-আর-ই-এস (লণ্ডন)

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

বার্ষ থেকে ব্যাসেলে আসবার সময় একটু ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করছিলাম। এ রকম যাবাবর বৃত্তি যেন আর ভাল লাগে না। রোজই এক এক জায়গায় সংসার পেতে আবার ১ দিন বা বড় জোর ২ দিন পরে পাততাড়ী গুটিয়ে আবার নতুন জায়গায় সন্ধান করা—এতে শরীর ও মনের বড় পরিশ্রম হয়। একটা অচেনা জায়গায় যাবার আগেই কত দুঃশ্চিন্তা মনে জাগে। সেখানে গিয়ে হোটেল পাব কিনা, আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দামের মধ্যে সে জায়গায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা, স্টেশন থেকে হোটেল কতদূর হবে (বেশী দূর হলেই তো গেছি। বড় এবং ভারী একটা স্কটেকশ দূরে নিয়ে যাওয়া যে কি ঝামেলা তা আমরাই বুঝি। নেহাৎ দুর্ভাগা ছাড়া ক্ষতি করতে এসে কেউ কুলীর মোট নিয়ে মরে।)—এ সব কত কি ভাবনা। নতুন জায়গা দেখার আনন্দ থেকেও, সেখানে থাকাখাওয়ার জায়গা খুঁজে বের করার আতঙ্কটাই অনেক সময় বেশী হয়ে পড়ে। এই আতঙ্কটা থাকতো না যদি (১) যে কোন দামে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করার মত সামর্থ্য আমাদের থাকতো (২) বা সবরকম খাবার খাওয়াতে আমি অভ্যস্ত হতাম (এদেশে খুব বাছাই করে ২৩টা রেস্টোরা খুঁজে বের করতে হয় যেখানে নিরামিষ বা শুধু ভিন্ন রান্না করে) (৩) অথবা ওদের ভাষা বুঝতাম। কিন্তু এ ৩ টের কোনটাই পূরণ করতে পারছি না—তাই আতঙ্কটা রয়েছে। আশ্চর্য্যের সাথে এই অসুবিধা সবচেয়ে বেশী হবে এই আশঙ্কা করে আমার বন্ধুটি তো জাৰ্মানীতে নামতে কিছুতেই রাজী হলো না—সে সোজা হল্যান্ডে আমস্টার্ডাম গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমি এক রাজ্জে বাসেল ছেড়ে পরের দিন সকালে কোলন পৌছব, সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যায় গাড়ীতে কোলন

ছেড়ে রাজ্জে ১২টায় আমস্টার্ডাম পৌছব। আগের রাজ্জিটা ট্রেনে কাটবে আর আমস্টার্ডামে রাত ১২টায় পৌছে যদি হোটেল না পাই, তবে সে রাজ্জিটাও স্টেশন ওয়েটিং রুমে বসে (শুয়ে নয়, কারণ বিছানা নেই সঙ্গে) কাটাতে হবে। পর পর ২ রাজ্জি আগরপের সম্ভাবনায় এখন থেকেই ভয়ে আধমরা হয়ে আছি। এত কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে, শুধু জাৰ্মানীতে রাজ্জিবাস এড়ানোর জন্য! রাজ্জিবাস না করতে হলেই হোটেল ঠিক করার প্রয়োজন হবে না, একদিনের জন্য স্টেশন থেকে হোটেলের মাল্ল বয়ে নিয়ে যেতে হবে না, এদের ভাষা বোঝারও চেষ্টা করতে হবে না—অনেক দিক থেকেই নিশ্চিন্ত! কী ছবস্থা ভাব দেখি। যে টাকা ইউরোপ বেড়ানোর জন্য খরচ করছি, তা এদেশের তুলনায় অতি সামান্য এবং এতে বহু কষ্টে এখানকার খরচ চালাতে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশের তুলনায় এ টাকাটা পরিমাণে অনেক এবং এতে প্রায় সারা ভারতবর্ষ হাজারগুণ আরামে ঘুরে বেড়িয়ে শতগুণ বেশী উপভোগ করা যায়। আর বেড়ানোর জায়গা বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা যদি বল, তাহলে আমি জোর গলাতেই বলবো, (সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে ভাল জায়গাগুলোই আমি দেখেছি, কাজেই জোর গলায় বলার অধিকারও আমার আছে) ভারতের দার্জিলিং শিলং বা মুর্শাবী, নৈনিতাল কোন অংশে খারাপ নয়। কাশ্মীর না দেখে সুইজারল্যান্ডে চুটে আসা মূল্যতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। নিজের দেশের সম্পদকে আমরা আদর করতে, শিখিনি—পর্যটনভার এই সবচেয়ে বিষময় ফল, তাই আজও আমাদের এত ছবস্থা। আমাদের দেশে ভালরকম বেড়ানোর ব্যবস্থা যদি গম্ভীরমেন্ট করতে পারে এবং এ সম্বন্ধে ইউরোপ আমেরিকাতে প্রচারের চেষ্টা করে তাহলে Tourist Traffic শতগুণে বেড়ে যাবে এবং সেটাই

দেশের অন্ততম প্রধান উল্লার-রোজগারের উপায় হবে। সুইজারল্যান্ড এইটুকু দেশ, শুধু tourist traffic আর ঘড়ী বিক্রীতে আন্ত ইউরোপের সবদেশের ওপরে। এখানকার জীবনযাত্রার মান ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে ভাল; এদের কারেন্সীই পশ্চিম ইউরোপে একমাত্র হার্ড কারেন্সী।

যাক, বাজে কথা অনেক বলে ফেলেছি, এবার ব্যাসেলের গল্প কিছু করি। বার্ষিক ব্যাসেল ৬০ মাইল—২ ঘণ্টার যাত্রা। বেলা সাড়ে এগারোটায় এখানে পৌঁছে স্টেশনের ঠিক সামনেই Hotel Fortuna বলে হোটেলটাতে এসে উঠেছি। হোটেলটি মন্দ নয়—চার্জ ১০ ফ্রাঙ্ক, এটাই সুইজারল্যান্ডের 2nd class Hotelএর standard দাম। ১০ ফ্রাঙ্ক মানে হোল ১২ টাকা চার্জ শুধু ঘরভাড়া এবং সকালে চাকরির ভাত। আমাদের দেশের Firpo, Great Easternএ সারাদিনের সব meal নিয়েই চার্জ হবে ২২২৩ টাকা। ইউরোপে সকালে ব্রেকফাস্ট দেয় মাত্র চা ও রুটি। ইংল্যান্ডে যেমন ব্রেকফাস্টটা প্রধান খাওয়া লাফটা সাধারণ লোকে খুবই সামান্য খায়, এখানে ঠিক তারই উল্টোটা। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার রেওয়াজ এদেশে নেই, এখানকার লোকেরা খায়ও না, বিদেশী টুরিষ্টদের সামান্য চা রুটি দেওয়া হয়। এখানকার লোকেরা সাধারণতঃ দিনে ২ বার খায়, তাই পরিমাণে এক একবারে ইংলণ্ডের ডবল বা তারও বেশী খায়। পরিমাণ এত বেশী যে দেখলে মাঝে মাঝে ভয়ই করে। আর স্যালাড অর্থাৎ কাঁচা ঘাসপাতা একটু ভিনিগার দিয়ে এদেশের লোকে ভয়ানক খায়। এরা শুধু প্রায় জ্যান্ত রক্তমাখা গরু খেতেই ভালবাসে না, গরুর খাস্তটাকেও প্রচুর পরিমাণে উদরসাৎ করে।

ব্যাসেল সহর রাইন নদীর ওপরে—জার্মানী ও সুইজারল্যান্ডের সীমানার। সহরের মাঝখান দিয়ে রাইন নদী বয়ে চলেছে—সুন্দর পরিষ্কার জল, টেমসের মত ঘোলা অপরিষ্কার নয়। চওড়াতেও টেমসের থেকে অনেক বড়। রাইন নদী ইউরোপের অন্ততম প্রধান জলপথ। ব্যাসেল সহরের মধ্যে এর দুপাশ চমৎকার বাঁধানো এবং মাঝে মাঝে সিঁড়ি আছে, জল পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়। ঘাটের ওপরই বসার জম্বা বেঞ্চি আছে। সহরের এই অঞ্চলটা ভারী সুন্দর এবং বেড়ানোর শ্রেষ্ঠ জায়গা। কাল রাইন নদীর

ধারে বসে জলে পা ডুবিয়ে খুব আরাম করে চিঠি পড়ছিলাম। তার আগেই টমাস কুকের অফিসে গিয়ে ২খানা চিঠি পেয়েছিলাম—একটা কলকাতা থেকে বন্ধুদের লেখা, অন্যটা গয়া থেকে মন্ট দের লেখা।

রাইন নদী সুইজারল্যান্ড ও জার্মানীর সীমানা—এর ওপারেই ব্যাসেলের আর একটি স্টেশন আছে, সেটা জার্মানরা Control করে। ব্রীজ পার হওয়া মানেই প্রকৃতপক্ষে জার্মানীতে ঢোকা! বন্ধুটিকে তাই বলছিলাম, দেশে ফিরে যখন বলবো পায়ে হেঁটেই সুইজারল্যান্ড থেকে জার্মানী চলে গেলাম, তখন হয়তো অনেকে আশ্চর্য হয়ে যাবে। ব্রীজ পার হলেই পাশপোর্ট, জার্মান গভর্নমেন্টের পারমিট প্রভৃতি লাগবে কিনা ভাবছিলাম। অবশ্য সেগুলো আমাদের সঙ্গেই ছিল এবং সবসময়ই থাকে। বিদেশে বেড়াতে এসে পাশপোর্ট ও এইসব বিভিন্ন গভর্নমেন্টের পারমিটগুলো সব সময়েই নিজের কাছে রাখতে হয়। বলী তো যায় না, কখন কি বিপদ হয়ে পড়বে। কিন্তু ব্রীজ পার হয়ে আমরা ব্যাসেলের জার্মান স্টেশন পর্যন্ত চলে গেলাম, কেউ কিছুই বললে না। পরে শুনিলাম, রাইন নদী সহরের বাইরে ২টো দেশের সীমানা হলেও, administrative সুবিধার জন্য সারা সহরটাই সুইসদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সহরের কোণে জার্মান রেল-স্টেশন এবং সহর ছাড়ালেই জার্মানী আরম্ভ হয়। ব্যাসেল সহরে রাইনের ওপর মোট ৭ টি ব্রীজ আছে। এর মধ্যে ২ টি রেলওয়ে ব্রীজ।

বার্ষিক বা ব্যাসেলে বাস নেই, সবই ট্রাম। পেট্রোল এদেশে নেই, কিন্তু hydro-electricity এরা প্রচুর তৈরী করে ব্যয়ণা ও হ্রদ থেকে। তাই কোন সহরেই বাস চলে না, সর্বত্রই ট্রাম। ট্রেনও ইলেকট্রিক চলে। ব্যাসেলও খুবই ছোট সহর, চার ঘণ্টার মধ্যে পায়ে হেঁটেই সবজায়গা ঘুরে দেখা যায়। এখানেও আমাদের সহরের মধ্যে বেড়ানোর জন্য কোন ট্রামথরচা হয়নি। প্যারিসের পর সুইজারল্যান্ডের কোথায়ই ট্রামবাস থরচা লাগেনি! অল্প সময়ের মধ্যে সহরটা ভাল করে দেখতে ও চিনতে হলে পায়ে হেঁটে ঘোরা ছাড়া উপায়ও নেই। প্রত্যেক ষ্টেপে ষ্টেপে তো আর ট্রামবাস থেকে নেমে দেখা চলে না! সুইজার-

ল্যাণ্ডের সহরগুলোর একটি ভাল ব্যবস্থা দেখছি। প্রত্যেক হোটেলে কোন টুরিষ্ট এলেই একখানা করে গাইড বই বিনা পরসার দেয়। এতে সহরের ম্যাপ, দ্রষ্টব্য জিনিষ (কখন খোলা এবং কত দর্শনী তা শুদ্ধ), ট্রামবাসের রুট, সিনেমা থিয়েটার, কনসার্ট, নাইট ক্লাব, সুইমিং পুল, বড় বড় দোকানপত্র, হোটেল রেস্তোরা প্রভৃতির বিবরণ—অর্থাৎ টুরিষ্টদের বা যা প্রয়োজন সমস্তই এই বইতে দেওয়া থাকে। যে সমস্ত হোটেল, রেস্তোরা, দোকান ক্লাব প্রভৃতির বিজ্ঞাপন এতে থাকে তারাই এই বইয়ের খরচা বহন করে—টুরিষ্টদের পরসার দিয়ে কিনতে হয় না! এটা একটা কম সুবিধা নয়! এই সঙ্গে প্রত্যেককে একখানা করে কার্ড দেওয়া হয়। সেই কার্ড দেখালে এখনি কার বিভিন্ন ক্লাব, সুইমিং পুল, টেনিস লন, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের জায়গায় ও বড় বড় দোকানে ১০ থেকে ২০% সস্তা পাওয়া যায়। অবশ্য এ কার্ড আমরা কখনো ব্যবহার করার সুযোগ পাইনি, কারণ কোন আমোদ প্রমোদেই আমরা যোগ দিইনি পরসার অভাবে, কিছু জিনিষও কিনিনি—ঐ একই কারণে।

বাসেল হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের মিউজিয়ম সহর—এখানে অনেকগুলো মিউজিয়ম আছে। এ ছাড়া গির্জাও অনেক-গুলো আছে এবং বহু প্রাচীন প্রাচীন সব গির্জা। সহরটা খুবই ধর্মভাবাপন্ন বলে মনে হয় যেন। লোকজনের ভীড় এখানে খুবই কম এবং ষ্টেশনের কাছে শানিকটা জায়গা ছাড়া বাকী সহরটা প্রায় নির্জন বলা চলে। এখানকার দোকানপাট সব লণ্ডনের মত বেলা ৫ টাতেই বন্ধ করে দেয় না। টুরিষ্টদের কাছে জিনিষ বিক্রী করতে হলে রাত্রি ৮টা ৯টা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখতে হয়, তা এরা বেশ ভালই বোঝে।

* * * *

লণ্ডন থেকে আমাদের যে টিকিট দিয়েছে, তাতে কয়েকটা মারাত্মক ভুল রয়ে গেছে; সেটা এতদিন পরে আবিষ্কার করতে পারলাম। কোলন থেকে আমস্টার্ডাম যাবার সহজ যে রুট, সেটা না দিয়ে আমাদের টিকেট এমন এক রুটে দিয়েছে—যে পথে আমাদের ২৩ বার ট্রেন বদল করতে হবে এবং মাত্র একখানা গাড়ী সারাদিনে;

সেখানা আমস্টার্ডাম পৌঁছবে রাত্রি ১২টা ১০ মিনিটে। সহজ রাস্তায় টিকিট দিলে ভাড়াও কম লাগতো, আমরাও রাত দশটায় আমস্টার্ডাম পৌঁছতে পারতাম এবং তখন একটা হোটেল খুঁজে নেওয়া অসম্ভব হোত না। কাল তাই ব্যাসেলের ব্রুটিশ রেলওয়ে অফিসে ২৩ বার গিয়ে ঘণ্টাটুই সময় নষ্ট করেছি, যদি টিকিটটা বদলে নেওয়া যায় সেই চেষ্টায়। ইউরোপের বড় বড় সহরে টমাস কুকের মত ব্রুটিশ রেলওয়েরও শাখা অফিস আছে। টমাস কুকের মত এদের কর্মীরাও ইংরেজী জানে, তাই আমরা বিদেশে সর্কজ—আমাদের বা কিছু প্রয়োজনের জন্ত এদের দ্বারস্থ হই, নতুবা অন্য কাউকেই আমাদের প্রয়োজনের কথা তো জানাতে পারি না—ভাবার অসুবিধার জন্তই। কালকেও ব্রুটিশ রেলওয়ে অফিসে গিয়ে টাইমটেবল, ম্যাপ ইত্যাদি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করে যখন বোঝা গেল—আমাদের যে টিকিট আছে তাতে ঘোরা-পথে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই, তখন যে মেয়েটি আমাদের ব্যাপার নিয়ে দেখানুনা করছিল—অল্পবয়সী একটি জার্মান মেয়ে, লণ্ডনে ইংরেজী শেখার ছেড়ে গিয়েছিল; এ দেশ থেকে অনেকেই যায়—সে বয়স, এই বদলী করার জন্ত আমাদের ব্যাসেলের জার্মান ষ্টেশনে যেতে হবে, কারণ ব্যাপারটা তাদের দেশের মধ্যেই হচ্ছে। কথা শুনে অসহায়ের মত বলে ফেললাম—‘তাহলে তো আর কোন আশাই নেই! জার্মান ষ্টেশনে গিয়ে কি বলবো আর তারা কি বুঝবে তা ভগবানই জানেন। দেখছি, রাত ১২টায় আমস্টার্ডাম পৌঁছে, সে রাতটাও পথে পথেই কাটাতে হবে।’

আমার কথা বলার ধরনে মেয়েটি হেসে ফেললো, সে নিজেই প্রস্তাব করলো, অফিস থেকে ঘণ্টাখানেকের ছুটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে জার্মান ষ্টেশনে যাবে ব্যাপারটার সমাধান করার জন্তে। সম্পূর্ণ অচেনা একটি বিদেশী মেয়ের কাছে এতটা সৌজন্য আশা করা যায় না—সত্যিই অভিজ্ঞত হয়ে গিয়েছিলাম।

জার্মান ষ্টেশনে গিয়েও কিন্তু কোন সুবিধা হোল না; তারা বললে, যদি কেউ এ কাজ করতে পারে, তাহলে একমাত্র কোলন অফিসই পারবে—অন্য কেউ নয়। মেয়েটিকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ফিরে এলাম।

ব্যাসেলে আমার বন্ধুর একটি বন্ধু থাকে। কাল সন্ধ্যায় তাকে কোন করে তার সঙ্গে আমরা দেখা করে ভিনজনে সহর দেখতে বেরোলাম। এ ছেলেটিও অল্পবয়সী, লগুনে ইংরেজী শিখতে গিয়েছিল, ফিরে এসে চাকরী করছে। ২৩ মাসের মধ্যেই এর বিয়ে হবে, ক্রমাগত তাই সে ভাবী স্ত্রীর গল্প করতে করতে শেষে বল, চলো, তাদের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই—সে-ও ইংরেজী জানে।’ সহরের আর একপ্রান্তে সেই মেয়েটার বাড়ী। গেলাম সেখানে এবং পরিচয়ও হলো মেয়েটির সঙ্গে। এ সেই মেয়ে—যার সঙ্গে বৃটিশ রেলওয়ে অফিসে আমাদের দেখা হয়েছিল এবং সকালে ২ ঘণ্টা একসঙ্গে কাটিয়েছিলাম। কি রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার বল তো! আরও আশ্চর্য্য—এই লাইনের আগের লাইনটা যখন লিখছি তখন সেই ছেলেটি এবং মেয়েটি দু’জনেই আমাদের হোটেলে আমাদের ঘরে এসে ঢুকলো! তাদের বসতে বলে চিঠির এই বাকি লাইনটা শেষ করলাম।

* * * *

ব্যাসেল এবং সুইজারল্যান্ড ছেড়ে চললাম আজ আমরা। জীবনে আর কখনো এ সব দেশে আসা হবে কি না জানি না; না হলেও খুব যে দুঃখ পাবো তাও নয়। এ দেশ সঘন্থে মোহ আমার কেটে গেছে। এবার ভালো করে নিজের দেশ না দেখে আর কখনো বাইরে যাবার নাম করব না। এরই মধ্যে আমরা ইউরোপ সঘন্থে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছি এবং সব সময়েই ইচ্ছা করে এবার লগুন ফিরে যাই। আমার বন্ধুটি তো ফিরে যাবার জন্তে পা তুলেই আছে—এবং সম্ভবতঃ আমষ্টার্ডাম থেকেই সে সোজা লগুন ফিরবে। আমারও যদি সামনের বছর এখানে আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে লগুনেই

এবার ফিরতাম। নেহাৎ টিকিট সব কাটা রয়েছে এবং এখন না গেলে জীবনে হয়তো আর সুযোগই মিলবে না, তাই এগিয়ে চলেছি। নতুন নতুন দেশ দেখার ইচ্ছা আর বড় একটা নেই; নিজের দেশে ফেরার জন্তই এখন প্রাণটা ছটফট করছে!

এদেশে নিজের দেশের সামান্য কোন চিহ্ন দেখলেই মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। ফরাসীদেশে লোকে চা খায় না, কিন্তু সুইজারল্যান্ডে চায়ের চলন খুব বেশী। এখানে লোকে চা খায় অদ্ভুতভাবে। কাপে নয়, E.P.N.S.এর হাতল সমেত কাঁচের গ্লাসে এবং কাজললতার মত মাথার দিকটা ফুটো-ফুটো একটা জিনিষের মধ্যে চায়ের পাতা রেখে সেটা চায়ের গ্লাসের গরম জলে ডুবিয়ে দেয়। যে যে রকম কড়া বা লাইট চা খায়, সেই অনুযায়ী ঐ কাজললতা জাতীয় জিনিষটা জলের মধ্যে অল্প বা বেশীক্ষণ রাখে। কোন চা দেওয়া হলো, তা একটা লেবেলে মেয়ে ঐ কাজললতার সঙ্গেই আটকে দেয়। বার্ষে প্রথম ঐ লেবেল লক্ষ্য করে দেখলাম—Best Bengal Tea। এখানেও সমস্ত রেষ্টোরাঁয় চা দেখেছি—Darjeeling Blend। নিজের দেশের জিনিষ বিদেশে এত কদর পেয়েছে দেখলে সত্যিই খুব ভাল লাগে।

কোলিন হয়ে আমষ্টার্ডাম পৌঁছব পূর্ণদিন ২৫শে তারিখে। নেমেই টমাস কুলের অফিসে পৌঁছ নেবো আমাদের কোন চিঠি এসেছে কিনা। আজ ১৪।১৫দিন বাড়ীর কোন চিঠি না পেয়ে মনটা বড় অস্থির হয়ে পড়েছে। আশা করি তোমরা সবাই ভালই আছ। আমিও এখন একরকম ভালই আছি। ফরাসীদেশের শক্ত রুটি চিবোতে গিয়ে দাঁত ভেঙ্গে মাঝে কয়েকদিন খুব যন্ত্রণাভোগ করেছিলাম, এখন আর দাঁতের যন্ত্রণাটা নেই।

- [ক্রমশঃ]

শিক্ষক, তুমি জাতীয় জীবন গঠনে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। স্বাধীন ভারত তোমাকে আহ্বান করিতেছে। শত অভাব ও অনটনের মধ্যেও কর্তব্যভ্রষ্ট হইও না—নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতে চেষ্টা কর।

মনে নেই চিন্তা

শ্রীপ্রদীপকুমার চক্রবর্তী

মনে নেই চিন্তা।

হেসে খেলে নেচে গেয়ে

কেটে যাক্ দিনটা।

ইস্কুল বন্ধ

আয় ভাই নন্দ

বঁধে নিই দোলনা

পড়াশোনা ভোলনা,

যত খুলী ঝোলনা,

কেয়া মজা বলনা।

ওই রোদ উঠেছে,

কেয়া ফুল ফুটেছে,

ভেসে আসে গন্ধ।

ইস্কুল বন্ধ

আয় ভাই নন্দ।

মারি বল ধাঁই সে

পাঁই পাঁই পাঁইসে

উঠে যাক্ আকাশে

পাক খেয়ে বাতাসে।

নেমে এলে বলটা

হয়ে যাবে গোলটা।

এই যাঃ!

ছিঁড়ে গেছে দোলনা,

কুছ্ মৎ বোলনা।

তোল্-তোল্-তোলনা

টান ভাই এই সে

হেঁই-হেঁই-হেঁইসে।

বোল্ মৎ কেইসে

শুধু নাচ মিন্তা...

মিন্-মিন্-মিন্তা।

দূর কর চিন্তা

কেটে গেল দিনটা।

তফাৎ

শ্রীরঞ্জিত কুমার রায় চৌধুরী

দেহের ওজন হোকনা বেশী তবুও সে নয় ভারী
মনের ওজন বাহার বেশী সেই ভারী নামধারী।
কাজের গাদায় জড়িয়ে থাকে বতই খাটিয়ে হোক
কাজের শেষ যে করতে নারে নয় সে কাজের লোক।
শাসন কঠিন ডরে লরাই সে নয়ক তবু বড়—
সমান চোখে করে শাসন, তাকে সবার সেবা ধর।
ছড়িয়ে টাকা নাম কেনাটা বলবনা কতু দামী—
ভালবাসায় যেমনটি কেনে সেই যে আসল নামী।

তর্ক করলে বকলে বেশী বলব না তায় জানী।
যুক্তিপূর্ণ, একটি কথা পাণ্ডিত্যের যে বাণী;
মুখোস পরা ভক্ত-সাজে মাছুষ সে নয় খাটি,
মাছুষ তাবেরই বলব শুধু মনটি বাহার মাটি।
প্রজ্ঞা আছে, সাহস আছে, কাজের সময় নাই,—
বিপদে বল, সাহস দেখায় তারি বলিহারি বাই।
অর্থ নিয়ে দান করে যে বলবো না তার কথা,
আপনারে যে বিলিয়ে দেয় সেই আসল দাতা।

(৮০ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

হইবেন কারণ শিক্ষার ব্যয় তখন বাপানের উপর
বর্জাইবে। ফলে এমিক হইতে যে টাকা বাচিবে সে টাকা
অপর শিক্ষকদের ও শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে
পারিবেন। ছেলে মেয়েবাও নিত্য নূতন সরঞ্জামের
আকর্ষণে স্কুলে আসিতে থাকিবে। শিক্ষকদের উপর আদেশ
থাকিবে তাহারা যেন দেখেন যে যে সকল ছেলেমেয়ে
স্কুলে আসিবে তাহারা প্রাথমিক স্কুলের শেষ পরীক্ষা না
দেওয়া পর্যন্ত স্কুলে আসিতে বাধ্য থাকে। যদি কোন

অভিভাবক বা ম্যানেজার তাহাদের কাজে পাঠান তবে
তাহাদের দণ্ড দিতে হইবে। ইহা ভিন্ন প্রতি মাসে
শিক্ষকদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পরিদর্শকের
নিকট অবর পরিদর্শকের মাধ্যমে শিক্ষার উন্নতি,
অবনতি ও ইহার কারণ বর্ণনা করিয়া রিপোর্ট দাখিল
করিবার আদেশ দিন। আমাদের মনে হয় এই প্রকার
কঠোর কোন আইন চালু না হইলে চা বাগানের ছাত্রদের
মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কখনই সম্ভবপর হইবে না।

বিজ্ঞানের বিচিত্র বার্তা

আবর্জনা হইতে নানা সামগ্রী তৈরী

ফলের ও তরকারীর খোসা, ভুট্টার ভুষি, খড়, মোরগ ও হাঁসের পালক এবং অন্যান্য আবর্জনা তেমন কোন বিশেষ কাজে লাগে না। কিন্তু আমেরিকায় বিজ্ঞানীরা আজ এসব আবর্জনাকেও সম্পূর্ণ পরিণত করেছেন। এই সব আবর্জনা থেকে নতুন ধরণের খাদ্য, নানারকম ওষুধ, আরও অনেক রকম শিল্পদ্রব্য তৈরী হচ্ছে।

তুলোর বীজ, ধনের ভুষি, ভুট্টার ভুষি এবং ওটের ভুষি থেকে বিজ্ঞানীরা আজ ফারফার্যাল নামে তৈলজাতীয় একটি তরল পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। এই ফারফার্যাল নানারকম রং, প্লাস্টিক, মোটরগাড়ীর টায়ার, নিলন প্রভৃতির প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় কোয়েকার ওটস কোম্পানী এই জিনিষটি তৈরী করছেন। পূর্বে এঁদের প্রচুর পরিমাণে ওটের ভুষি নষ্ট হতো।

ষষ্ঠীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগের ইনজিন পরিষ্কারের জন্য এমন একটি জিনিসের প্রয়োজন হল, যে, জিনিসটি দ্বারা ইনজিন পরিষ্কৃত হলেও তা দ্বারা ইনজিনের কোন ক্ষয় ক্ষতি হবে না। বিজ্ঞানীরা এর পরেই ধানের ভুষি, বাদামের খোসা, ভুট্টার ভুষি নিয়ে গবেষণা করতে লেগে গেলেন। এই গবেষণার ফলে এমন একটি বস্তু তাঁরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন যা দিয়ে বিমান ও মোটরগাড়ীর ইনজিন বৈদ্যুতিক মোটর ও জেনারেটর সমূহ পরিষ্কার করা যায়।

তা ছাড়া ফলের ও তরকারীর আবর্জনা থেকে বিজ্ঞানীরা নানাজাতীয় খাদ্যবস্তু তৈল ও ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। যেমন টিনজাত করার সময়ে অনেক ক্রাসপাতির অপচয় ঘটে থাকে। আজ আর তা হয় না, গৃহপালিত জন্তু সমূহের পুষ্টিকর খাদ্যরূপে তা ব্যবহৃত হয়।

নানাভাবে কাগজের ব্যবহার নিত্যই বাড়ছে। একরকম পুরু কাগজ ও বোর্ড তৈরী হচ্ছে গমের খড়, থেকে। এই কাগজ দিয়ে তৈরী বাস্ক কার্টে-তৈরী বাস্কের মত শক্ত না হলেও বেশ মজবুত। সংবাদপত্র মুদ্রণের জন্যও এই ধরণের কাগজ ব্যবহৃত হচ্ছে।

এতকাল আমেরিকায় প্রায়শ্চন্দ্রিকোটি পাউণ্ড মুরগীর পালক এমনি নষ্ট হত, কোন কাজে লাগানো হত না। আজ বিজ্ঞানীরা সেই সব পালক হতে এক ধরণের সার প্রস্তুত করেছেন। তা ছাড়া অট্টালিকার পলস্তারা এবং তুলির ত্রাশও এই পালক থেকে তৈরী হয়েছে।

পরিভ্রান্ত সরতোলা দুধ হতেও এমন একটি সামগ্রী প্রস্তুত হয় যা তুলি ও গদির ছিবড়ে রূপে ব্যবহৃত হয়। এই জিনিষটি দেখতে ঠিক ঘোড়ার গায়ের লোমের মত।

স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি

অটোমেটিক ঘড়ির কথা সকলেই শুনে থাকবেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই এক সুইস কারিগর এই ধরনের একটি স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি তৈরী করতে পেরেছিলেন। যে স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি আজকাল তৈরী হয়েছে, হুশা বছর আগেকার সেই সুইস শিল্পীই তার পশ্চৎ। স্বয়ংক্রিয় ঘড়িতে দম দিতে হয় না। সে তার গতিশক্তি সংগ্রহ করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি থেকে। যে-কারণে পাহাড়ের উপর থেকে নদীর জলধারা সমস্তল ভূমিতে নেমে আসে, স্বয়ংক্রিয় ঘড়ির গতিশক্তির পিছনেও সেই একই কারণ বর্তমান রয়েছে। সামান্য একটু আন্দোলন, তা থেকেই স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি তার গতিশক্তি সংগ্রহ করে নেয়—এ-ঘড়ি এতই সূক্ষ্মভাবে তৈরী। দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলামের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির দম ফুরিয়ে আসতে থাকে। স্বয়ংক্রিয় ঘড়িতে পেণ্ডুলামের এই ক্রিয়ার ঠিক উল্টো-পদ্ধতিটিকে কাজে লাগানো হয়েছে। যতই সামান্য হোক না কেন, ইহাতে আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার দম-সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে।

আব্রাহাম লুই পেরেলটকে স্বয়ংক্রিয় ঘড়ির জনক বলা হয়। ১৭২৯ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর তৈরী স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি আকারে একটি অষ্ট্রীচের ডিমের মতো ছিল। পকেটে নিয়ে হাঁটাচলা করার সময় আপনা থেকেই সে-ঘড়ি গতিশক্তি আহরণ করতো। এই স্বয়ংক্রিয় ঘড়ি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বহুদিন এ-বিষয়ে আর কোনো গবেষণা হয়নি। সুইস কারিগরদের হাতে আজকাল এর অসাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।



পতন মাসের শেষ সপ্তাহে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার জন ছাত্র জনৈক উপদেষ্টার সহিত ভারতবর্ষ ও সিংহল প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছে। পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দ্বারা বিভিন্ন দেশবাসীর মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করা ইহাদের উদ্দেশ্য।



সোভিয়েট রাশিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোক হইতে বঞ্চিত কাজান প্রভৃতি স্বদ্রব্যস্তী অঞ্চলেও শিক্ষাবিস্তারে তৎপর হইয়াছে। কাজান সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ পুস্তকাগারের-পাঠ গৃহে বিভিন্ন আত্মীয় ছাত্রছাত্রী আশ্রয়ণে রত হইয়াছে।

শিক্ষক আন্দোলন

জরুরী নোটিশ :- শিক্ষক বহুগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা যেন নিজ নিজ সমিতির কার্য্য বিবরণীর সহিত সমিতির সেক্রেটারীর সম্পূর্ণ ঠিকানা (অর্থাৎ স্কুল, পোঃ আঃ ও জেলা) লিখিয়া পাঠান। জেলা শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারিগণকেও জেলা এবং বিভিন্ন শাখা সমিতির সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্টের নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা দিবার জন্ত অনুরোধ করা যাইতেছে।

—শিঃ সম্পাদক

মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকগণের দাবী শিক্ষামন্ত্রীর সহিত অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরীর আলোচনা

গত ২৫শে আগষ্ট মঙ্গলবার মাধ্যমিক শিক্ষকগণের দাবী সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী দপ্তরখানায় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্মালাল বসুর সহিত পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের শিক্ষক প্রতিনিধি অধ্যাপক শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরীর স্মরণীয় আলোচনা হয়। অধ্যাপক রায় চৌধুরী মাধ্যমিক শিক্ষকগণের মাসিক ৩৫ টাকা করিয়া ভাতার এবং স্কুল কোডে নির্দিষ্ট নিম্নতম বেতনের দাবীর যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া ইহা কার্যকরী করিবার জন্ত শিক্ষামন্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সমগ্র দাবীগুলি এক সঙ্গে মিটানো সম্ভবপর না হইলে শিক্ষক প্রতিনিধিগণকে ডাকিয়া আনিয়া এ বিষয়ে অবিলম্বে অন্ততঃ একটি আপোষ করিবার জন্ত তিনি মন্ত্রী মহাশয়কে বলেন।

শিক্ষা বিভাগ হইতে স্কুল কোড সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে

মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিকট যে প্রস্তাব লেখা হইয়াছিল তাহা লইয়াও এই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তুঃখ করিয়া বলেন অনেকেই তাঁহাদের এই পত্রের ক্রমবর্ধন করিয়াছেন। শিক্ষকগণের দাবী সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং বহুক্ষণ আলোচনার পর তিনি বিষয়টি পুনর্বার বিবেচনা করিয়া এ সম্বন্ধে বতদূর যাহা করা সম্ভবপর তাহা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন।

মাধ্যমিক শিক্ষকগণের জন্ত সম্প্রতি বর্ধিত সরকারী ৫৭ টাকা ভাতার সহিত অনেক স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি তাঁহাদের দেয় ৫৭ টাকা ভাতা দিতেছেন না বলিয়া মঞ্চস্থল হইতে যে সকল অভিযোগ পাইয়াছেন শ্রীযুত রায় চৌধুরী তাহা শিক্ষা মন্ত্রীর গোচরে আনেন। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় কমিটির এই কার্য্য অসঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং বলেন কমিটি ইতঃপূর্বে শিক্ষকগণকে যে পরিমাণ ভাতাই দিন না কেন এই অতিরিক্ত ৫৭ টাকা ভাতাও তাঁহারা দিতে বাধ্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্তা আলোচনার পূর্বে মিউনিসিপ্যাল এলাকার প্রাথমিক শিক্ষকগণের ডেপুটেশন লইয়া রায় চৌধুরী মহাশয় শিক্ষামন্ত্রীর সহিত তাঁহাদের দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বর্তমান বৎসরের বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষকগণের জন্ত যে অতিরিক্ত ৫৭ টাকা ভাতা মঞ্জুর হইয়াছে তাহাও মিউনিসিপ্যাল এলাকার শিক্ষকগণকে দেওয়া হইতেছেই না অধিকন্তু এতদিন তাঁহারা যে ৪৭ টাকা করিয়া ভাতা পাইতেছিলেন তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবিলম্বে বাহাতে মিউনিসিপ্যালিটি অঞ্চলের শিক্ষকগণকেও এই ভাতা দেওয়া হয় তাহার জন্ত অধ্যাপক রায় চৌধুরী শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় প্রতিশ্রুতি দেন—শিক্ষকগণের পূর্ব প্রাপ্য ৪৭ টাকা ভাতা বন্ধ করা হইবে না এবং বাহাতে অন্ততঃ ৩৫ টাকা বা তাহার নিম্ন বেতন-ভোগী শিক্ষকগণ বর্ধিত ভাতা প্রাপ্ত হন তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিবেন। মিউনিসিপ্যাল এলাকার শিক্ষকগণের জন্য একটি সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারণের দাবীও তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবার আশ্বাস দেন।

অধ্যাপক রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত মিউনিসিপ্যালিটি

শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে কাটোয়া মিউনিসিপ্যাল শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীমসিংহপ্রসাদ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

হরিণঘাটা থানা প্রাঃ শিঃ সম্মেলন (২য় বর্ষ)

মদীয়া

গত ১৯শে জুলাই রবিবার হরিণঘাটা ডাক বাংলোর হরিণঘাটা থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ২য় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বহু শিক্ষক ও জনসাধারণ সমবেত হইয়াছিলেন। মদীয়া স্কুল বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র কুশারী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ও শ্রীযুক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এল. সি. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিক্ষা ও শিক্ষকদের বর্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থার বিষয় আলোচিত হয় ও তৎসম্বন্ধে ২৫টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী হাতের কাগজের একটি সন্মার প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল।

বর্তমান বৎসরের জন্ম নিয়মিত ব্যক্তিগণকে লইয়া নূতন কর্মপরিষদ গঠিত হয়। সভাপতি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, সহ সভাপতি—শ্রীনীলগোপাল মিত্র, শ্রীগৌরচন্দ্র মণ্ডল, সম্পাদক—শ্রীমণীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, সহ-সম্পাদক—শ্রীকীর্ত্তনচন্দ্র রায়, শ্রীকুমুদবল্লভ চট্টোপাধ্যায়।

গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি প্রধান :—

১। স্কুলবোর্ডের তিন ভাগের এক অংশ সভ্য প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্য হইতে নির্বাচন করা হউক। ব্যবস্থা পরিষদেও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক প্রতিনিধি লওয়া হউক।

২। অবিলম্বে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বিনামূল্যে পুষ্টিকর জল খাবারের ব্যবস্থা করা হউক।

৩। সমস্ত প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের মাহিনা পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই বাহাতে দেওয়া হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করা হউক।

৪। গ্রাম্য অঞ্চলের শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ৬০-৪-১০০ ও শিক্ষণ-শিক্ষা-অপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ৫০-৪-১০ টাকা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রধান শিক্ষকদের ১৫ টাকা অতিরিক্ত ভাতা দিতে হইবে।

৫। প্রত্যেক শিক্ষককে সরকারী কর্মচারীর জায় মাগুগি ভাতা ও রেশন দেওয়া হউক।

৬। শিক্ষাদানের নিত্য প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণও যথাসময়ে সরবরাহ করা হউক। সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'শিক্ষক' পত্রিকা সরবরাহ করা হউক।

৭। বেসিক ট্রেনিং গ্রহণকালে, শিক্ষকদের ভাতা ও বেতন স্কুলবোর্ডের সাহায্য এবং সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত উভয় প্রকার শিক্ষকদের দেওয়া হউক।

৮। শিক্ষকদের ইচ্ছানুযায়ী বেসিক বা জি, টি, ট্রেনিং গ্রহণ করিবার সুবিধা এবং বেসিক ট্রেনিং শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদিগকে অধিক-সংখ্যক বেসিক স্কুল না হওয়া পর্যন্ত আইমারী বিদ্যালয়ে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হউক।

৯। শিক্ষকদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসম্ভব বদলী বা নিয়োগের ব্যবস্থা করা হউক।

১০। বিভিন্ন প্রকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকদের জন্ম বেতনের একটি নিশ্চিত গ্রেড করা হউক এবং বিভিন্ন শিক্ষকের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সেই গ্রেডে বেতন বদ্ধি করা হউক। যে সমস্ত শিক্ষকের কম পক্ষে ১-বৎসর কার্য হইয়াছে তাহাদিগকে পূর্ণ বেতন সহ বৎসরে অন্ততঃ ১ মাসের পীড়িত বিদায় দেওয়া হউক।

শ্রীমণীন্দ্রকুমার বিশ্বাস

সম্পাদক

কাঁকিনাড়া বাসুহারা শিক্ষামন্দিরে

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

ইং ১৯৮১৫৩ তারিখে কাঁকিনাড়া বাসুহারা শিক্ষামন্দিরে মহাসমারোহে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীযুক্ত দয়্যারাম বেরী, এম, এল, এ, মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। শ্রীযুক্ত দয়্যারাম বেরী এম, এল, এ, মহাশয় ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে বলেন যে ভারত বহু কষ্টসাধন দ্বারা এই স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীগণ শিক্ষালাভ করিয়া বাহাতে দেশের এই স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে তিনি তাহার জন্ম উপদেশ দেন।

শ্রীমগেন্দ্রচন্দ্র নাথ

মতাবহিষেগ (চিঠি-৮৭)

(মতামতের অন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

[স্বল্প ভাষায় পরিষ্কার করিয়া শিক্ষকগণ তাঁহাদের অভাব অভিযোগেব কথা লিখিয়া পাঠাইবেন। অভিযোগের সত্যতার জন্য পত্রলেখকগণ দায়ী হইবেন। মিথ্যা অভিযোগ করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। শি: সঃ]

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কি বিলুপ্ত?

পশ্চিম বাংলায় বাম ও দক্ষিণপন্থী দুইটি প্রাথমিক সমিতি গঠিত হইয়াছে, সংবাদপত্রে তাহা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব কি কাগজপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে? শিক্ষাবিভাগ মিউনিসিপাল এলাকাব প্রাঃ শিক্ষকদের অগ্রায় করিয়া বাজেটে নির্দিষ্ট বরিত বেতন ও ভাতা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। আপনি 'শিক্ষক' পত্রিকা হইতে বার বার তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। কিন্তু দুই সমিতির কর্তৃপক্ষই এ বিষয়ে নীরব। অথচ শিক্ষকদের নিকট হইতে টাকা লইবার বেলায় উভয় সমিতিই সান্তিশয় তৎপর। লজ্জার কথা নহে কি?

জৈনক স্পষ্টভাষী

মৃত্যুপথযাত্রী প্রাঃ শিক্ষকের আবেদন

মহা সঙ্কটে পড়িয়া আজ আপনাদের শরণাপন্ন হইতেছি। আমি বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল থানার অন্তর্গত জুকুরাকান্দর গ্রামেব প্রাঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। হঠাৎ যক্ষ্মার কবলে পড়িয়া গত কয়েক বৎসর বাবৎ যোগ ভোগ করিতেছি। দীর্ঘদিন রোগে ভুগিয়া আমি নিম্নরূপ অর্থ-সঙ্কটে পড়িয়াছি। বর্তমানে আমার পুষ্টিকর পণ্য ও ঔষধপত্রাদি ক্রয় করিবার কোনও সামর্থ্য নাই। আমার কাতর নিবেদন—আমাব জেলাবাসী আমাব এই বিপদের দিনে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া আমাকে বক্ষা করুন।

শ্রী বক্রিমচন্দ্র মল্লিক

কুমুদশংকর যক্ষ্মা হাসপাতাল, ও-এ-এস ওয়ার্ড
বেড নং ২, কলিকাতা—৩২.

শিক্ষকের অনশন সঙ্কল্প

আমি উদ্বাস্ত পুনর্বসতি প্রাঃ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। উদ্বাস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে যে ক্রমবর্ধমান হাবে বেতন দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া জেলা স্কুলবোর্ড নিযুক্তিপত্র দিয়াছেন, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিবাদার্থে শিক্ষককুলের পক্ষ হইতে আমি শীঘ্রই আমরণ অনশন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। এ সম্বন্ধে দেশবাসীর পক্ষ হইতে সুপারিকল্পিত নির্দেশ ও সহযোগিতা আশা করিতেছি।

বিনীত

সাঁওতাল পুর
জলপাইগুড়ি

শ্রীশ সরকার
চাপানী পুনর্বসতি বিদ্যালয়

বাঁকুড়া বোর্ডের নিকট আবেদন

জেলা বাঁকুড়া, সার্কেল গোণামুখী অধীন জামশোলা মহেশা প্রাঃ স্কুলটি দবিত্ত পন্নী অঞ্চলে অবস্থিত। পন্নীবাসী দের ছরবস্তার জন্য স্কুলগৃহটি কোন রকমে বজায় রাখা হইয়াছে। ছেলেদের বসিবার বেঞ্চ নাই—টেবিল, চেয়ার বলিতে বিশেষ কিছু নাই। বাহাতে স্কুলগৃহটির একটি স্থায়ী ছাদ হয় ও আসবাবপত্রাদির মধ্যে অন্ততঃ দুইখানা বোর্ড ও দুই একটি চেয়ারের জন্য কিছু পাওয়া যায় তৎক্ষণ বাঁকুড়া জেলা স্কুলবোর্ডের স্ফুটী আকর্ষণ করিতেছি।

—দরিদ্র পন্নীবাসী

২৪ পরগনা বোর্ডের নিকট আবেদন

আমি মধুরাপুর সার্কেলের অন্তর্গত ১০নং ইউনিয়নের ৭০৫নং পার্বতীপুর-শ্রীধরপুর ফ্রি প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে আজ ৩ বৎসর যাবৎ কার্য করিয়া আনি-তেছি। গত ১৯৫১ সালের ২৫শে মে বাণীপুর বুনিয়াদী ক্যাম্পে এডাল্ট ট্রেনিং লইতে গিয়া ৩০শে জুন পর্যন্ত উক্ত ট্রেনিং লইয়া ১লা জুলাই হইতে পুনঃ স্কুলের কার্যে যোগদান করিয়াছি ও যথাসময়ে রিটার্ন দিয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি উক্ত জুন ও জুলাই মাসের বেতন এ পর্যন্ত পাই না। এ বিষয়ে মাননীয় শ্রীযুত বাবু অনিলচন্দ্র ঘোষ সার্কেল সাব ইনস্পেক্টর মহাশয়কে জানাইলে তিনি বলেন যে তিনি বিল করিয়া দিয়াছেন। এবিষয়ে বোর্ডে বারবার দরখাস্ত করিয়াও কোন ফল হয় নাই।

আমার কাতর প্রার্থনা—এই দুই মাসের বেতন আমাকে শীঘ্র দিবার ব্যবস্থা করা হউক।

শ্রীযুগাংগুভূষণ নাইয়া

শিক্ষা সংবাদ

বিহারে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা সুযোগ

১১ বিহার রাজ্যের ভাষাগত সংখ্যালঘুদের হাই স্কুলে মাতৃ-ভাষায় মাধ্যমে শিক্ষালভের অধিকতর সুযোগ দিবার জন্য বিহার সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া, উর্দু, মৈথিলী, সাঁওতালী, গুরাওঁ, হো, মুন্ডারী এবং গ্র্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা হিসাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। আরও স্থির হইয়াছে যে অষ্টম শ্রেণী হইতে উপরের দিকে ভাষা ছাড়া অন্যান্য বিষয় সাধারণতঃ হিন্দীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। তবে ভাষাগত সংখ্যালঘুরা নিজেদের মাতৃভাষায় মাধ্যমে সকল বিষয় শিখিতে চাহিলে কোনও আপত্তি উঠিবে না।

শিক্ষিত বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি

গত ২৮শে আগষ্ট লোকসভায় উপ-প্রমমন্ত্রী বলেন—কর্মসংস্থান কেন্দ্রের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৫৩ সালে জুন মাস পর্যন্ত ম্যাট্রিকুলেট ও গ্রাজুয়েট চাকুরীপ্রার্থীর সংখ্যা বৎসরক্রমে প্রায় ৭২ হাজার ও ২ হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আসামের শিক্ষকদের দাবী

গত ২৬শে আগষ্ট আসাম বিধান পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, আসামের সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষকদের দাবী-দাওয়ার প্রসঙ্গটি রাজ্য সরকার বিবেচনা করিবেন। তবে অজ্ঞাত রাজ্য-সরকারের নিকট হইতে সেখানকার তথ্যগুলি এখনও পর্যন্ত না আসায় দক্ষণ আসাম সরকার এ বিষয়ে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না।

অমৃতসীর্গ ছাত্রকে পাশ করা হইবার আদেশ

গত ১৮ই আগষ্ট প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি শ্রীযুক্ত ডেকাকে লইয়া গঠিত আসাম হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারী শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র দাসকে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫২ সালের বি এস-সি (কৃষি) পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষণা প্রকাশ করিতে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

প্রতিবাদী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এডভোকেট-জেনারেল বলেন যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে পরীক্ষার্থীকে কোন বিষয়ের প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে শতকরা ৩০ নম্বর পাইতে হইবে। কিন্তু বিচারপতিস্বর সিদ্ধান্ত করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধানানুযায়ী পরীক্ষার্থীকে প্রত্যেক বিষয়ে শতকরা ৩০ অথবা ততোধিক নম্বর পাইতে হইবে প্রত্যেক বিষয়ের প্রত্যেক প্রশ্নপত্রে ঐ নম্বর পাইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আবেদনকারী প্রয়োজনীয় নম্বর পাওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থানলাভ করিয়াছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

গত ২৮শে আগষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। কমিশন বর্তমান শিক্ষার বিভিন্ন গলদ ও সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া দেশের বর্তমান চাহিদা ও কর্মসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার উন্নয়নের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন।

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রধান বিষয়গুলি এই—

প্রাথমিক পর্যায়ের পর মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ৭ বৎসর হইবে। এই সময়ে শিক্ষার্থীর ইচ্ছানুযায়ী কারিগরী পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হইবে। তবে ভাষা, সমাজ বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়গুলি সকলেরই অবশ্য পাঠ্য হইবে। আঞ্চলিক মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম থাকিবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা ও একটি বিদেশী ভাষা শিখিতে হইবে। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি নিয়োগ করা হইবে। বিদ্যালয় বৎসরে অন্তর ২০০ দিন খোলা থাকিবে। প্রতি সপ্তাহে ৩৫টি পিরিয়ড বা ঘণ্টা থাকিবে। শিক্ষকদের বেতন ও চাকুরির সর্ভাবলীর উন্নতি করিতে হইবে এবং পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও বীমার জীবিত সুবিধা থাকিবে। শিক্ষাকেন্দ্রে উপযুক্ত লোক আকর্ষণের জন্য শিক্ষকদের পুত্রকন্যার শিক্ষা, বাসস্থান, রেলওয়ে ভ্রমণে সুবিধা দিতে হইবে। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থারও উন্নতি করিতে হইবে। সরকারী চাকুরিতে বর্তমানে প্রচলিত নিয়োগব্যবস্থা অচল, ইহা

নতুন করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রধানতঃ রাজ্যের দায়িত্ব হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারকে ইহার অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে যে সকল সরকারী বিভাগের সুবিধা হইবে তাহাদের কারিগরি শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য দিতে হইবে; শিল্পের উপরে কারিগরি শিক্ষা কর ধাৰ্য্য করিতে হইবে এবং শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ ভাগের আয়কর হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কি বুদ্ধি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে কি বুদ্ধি করিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে আপত্তি করিয়া গত ২৬শে আগষ্ট বুধবার কলিকাতার বিভিন্ন কলেজে ছাত্রছাত্রীগণ সভাপ্রতিষ্ঠিত মধ্যমিয়ার প্রতিবাদ দিবস পালন করে। কমিটির মতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্প্রতি বিভিন্ন পরীক্ষার ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে শতকরা ৫০ হইতে ১৫০ ভাগ কি বুদ্ধি করিয়াছেন।

এই দিন অপরাহ্নে কলেজ স্কোয়ারে মহাবোধি সোসাইটি হলে অস্থিতিত এক কেন্দ্রীয় সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কি বুদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র-সমাজের সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

সর্বশেষ সংবাদ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিপ্তিকেট আপাততঃ কি বুদ্ধির প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হিন্দী শিক্ষা প্রচার

গত ২৮শে আগষ্ট শুক্রবার সংসদের হিন্দী সমিতির প্রথম বাৎসরিক অধিষ্ঠানের সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে, প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু বলেন, “ভারতের অন্যান্য ভাষার ক্ষতিসাধন করিয়া হিন্দীর প্রচারকাৰ্য্য চালানো উচিত নয়। অহিন্দীভাষী অঞ্চলে যদি জোর করিয়া হিন্দী চাপাইয়া দেওয়া হয়; ইহার ফল ক্ষতিকর হইবে; ইহা দ্বারা ভারতের একা ব্যাহত হইবে।”

তিনি আরও বলেন, ভাষার প্রায় একটি অটল প্রায়। কোন ভাষাকে জনপ্রিয় করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিলে ইহার ফলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। ভারতের একা ও সংগতি রক্ষার জন্য আমাদের দেখিতে হইবে, যে, হিন্দীর উন্নতির সঙ্গে যেন দেশের ক্ষুদ্রতম ভাষারও কোন ক্ষতি না

হয়। হিন্দী আমাদের রাষ্ট্রভাষা হইবে, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু জীবন্ত ও প্রগতিশীল ভাষা হইবার জন্য হিন্দীকে অন্য ভাষার নিকট হইতে যথোপযুক্ত শব্দসম্ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারতীয় ছাত্রদের জন্য মিশরের বৃত্তি

স্বাক্ষরিত শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা অথবা সেচ, ইঞ্জিনিয়ারিং তুলা উৎপাদন ও বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে দুই বৎসরের জন্য মিশর সরকার ভারতীয় ছাত্রদিগকে দুইটি বৃত্তি দিবে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উত্তম ডিগ্রিধারী বৃত্তি প্রার্থীদের আবেদন বিবেচনা করা হইবে। প্রার্থীদের আরবী ভাষায় জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। বৃত্তি প্রার্থীদের বয়স ২০ বৎসরের কম হইলে চলিবে না। ৩১শে আগষ্টের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে।

শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

গত ২৬শে আগষ্ট শ্রীরামপুর কলেজের বার্ষিক উৎসবে সভানেত্রীর ভাষণ দান প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারী বর্তমানের প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য সাধনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, বর্তমানে পৃথিবীতে শিক্ষাকে পুঁথিগত বিদ্যালয়ের উপায় বলিয়া গণ্য করা হয় না, দায়িত্বের সহিত কতব্য পালনের জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবেই গণ্য করা হয়।

ছাত্রদের উদ্দেশ্য করিয়া রাজকুমারী বলেন, জীবনের বৃহত্তম ক্ষেত্রে যে সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহার সহিত পরীক্ষায় পাশ করা অথবা পুঁথির লাভ করার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

নিখিল বঙ্গ শিশু-সাহিত্য সম্মেলন

গত ২৯শে আগষ্ট, শনিবার বিকাল ৬টাখ শিশুসাহিত্য পরিষদের পরিচালনায় নিখিল বঙ্গ শিশুসাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীঅতুল গুপ্ত। বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করেন ডাঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ স্বপনচন্দ্র সিংহ, শ্রীমতী রাধারানী দেবী, শ্রীআশাপূর্ণা দেবী ও শ্রীস্বধীরচন্দ্র সরকার।

শিক্ষার জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়-বরাদ্দ
হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এডুকেশন কমিটি ও
প্রাথমিক এডুকেশন কমিটির এক যুক্ত সভা ১৯৫৩-৫৪
সালের মিউনিসিপ্যাল এলাকার শিক্ষা-খাতে ৩,৪৫,০০০
টাকা বন্টন করার স্থপারিশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত
খাতের ব্যয় বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য :—

মিউনিসিপ্যাল কত পঞ্চ পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়
বাবদ—১,৪১,৮৫০/-, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় বাবদ—
৮,৩৬৮/-, স্কুল গৃহ নির্মাণ ও সম্প্রসারণ বাবদ—২৫,০০০/-,
পাক্সাডায় একটি স্কুল গৃহ নির্মাণের অমি বাবদ—১৪,০০০/-,
হাওড়া গার্লস স্কুলের গৃহ নির্মাণের সাহায্য বাবদ—১০,০০০/-

ঢিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুরস্কার দান

১৯৫১ সালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী পুস্তক বিবেচনায় কলিকাতার
শ্রীনবসিংহ দাস অগ্রবাল স্থাপিত ১ হাজার টাকা মূল্যের
পুরস্কারটি 'শারীর-বিদ্যা' নামক পুস্তকের জন্য ডাঃ আর, কে,
পালকে দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় রাজনীতি বিজ্ঞান সম্মেলন স্থাপিত ১৯৫২
সালের রাজনীতি বিজ্ঞান রচনা পুরস্কারটি 'ভারতীয়
সংবিধানে মৌলিক অধিকার' শীর্ষক রচনার জন্য পাইয়াছেন
শ্রীদেবেন্দ্র সিং।

উদ্বাস্তর কারিগরী শিক্ষা

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর পূর্ববঙ্গের ১৬৫ জন উদ্বাস্তকে
শিল্প ও কারিগরী বিদ্যা শিক্ষাদানের একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে শিল্পের প্রকার ভেদ
অনুযায়ী ইহাদের ৬ মাস হইতে ১ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া
হইবে এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষাকালে মাসিক বৃত্তি পাইবে।
পশ্চিমবঙ্গে ৬টি ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৫০ জনকে গ্রহণ
করা হইবে এবং তাহাদের মাসিক ২৫/- টাকা হিসাবে বৃত্তি
দেওয়া হইবে। অপর একটি প্রতিষ্ঠানে ৫০ জনকে লওয়া
হইবে। কালিঙ্গপথের সেন্ট অলিফোনসাস শিল্প বিদ্যালয়ে
৪০ জনকে পশ্চিম সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং তাহাদের
মাসে ৩০/- টাকা হিসাবে বৃত্তি দান করা হইবে। ইহা
ভিন্ন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের দুতিনটি কেন্দ্রে
উদ্বাস্তদিকে ছোট বেসম হইতে দুইটা প্রস্তুতকার্য শিক্ষা

দিবেন বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। ধুবুলিয়াতে একটি কেন্দ্রে
দুইশত উদ্বাস্তকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। আ
একটি কেন্দ্রে ২৫ জন উদ্বাস্ত নারীকে শিক্ষা দেওয়া হইবে
এবং রূপশ্রী পল্লীতে দুইশত উদ্বাস্তকে শিক্ষাদানের জন্য
কেন্দ্র আছে তাহাও চলিবে।

পুনর্বাসন দপ্তর যাদবপুর মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি
মাংসক পক্ষাশ্রম উদ্বাস্ত মহিলাকে সেলাইর কাজ শিক্ষা
দানের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভারতীয় ছাত্রের জন্য বেলজিয়ামের বৃত্তি

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, স্বাতন্ত্র্যের শিক্ষা
অথবা কৃষি, ধাতুবিদ্যা, খনিবিদ্যা, নৌবিদ্যা, কাচশিল্প
রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বয়নশিল্প, গণিত ও পদার্থবিদ্যা
গবেষণা করিবার উদ্দেশ্যে বেলজিয়াম-গবর্নমেন্ট ১৯৫৩-৫৪
সালে ৮ মাসের জন্য ১ জন ভারতীয় ছাত্রকে ৩০৪৮/-
টাকার মত একটি বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শিক্ষা
মাধ্যম হইবে ফরাসী ভাষা।

পুস্তক ও পত্রিকাদির উপর বিক্রয় কর

গত ২৬শে আগষ্ট বুধবার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে
লাইব্রেরী হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত
এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে পুস্তক, পত্র
পত্রিকাদির উপর হইতে বঙ্গীয় বিক্রয়-কর রহিত করা
অনুরোধ জানান হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক
অধ্যাপক, শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

নীলদর্পণ আর, পি, বিদ্যালয়

গত ১৭ই জুন নীলদর্পণ আর, পি, বিদ্যালয়ে
ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি কবিতা প্রতিযোগিতা হয়
প্রতিযোগিতার ছাত্র-ছাত্রীদ্বয়কে পুরস্কার দেওয়া হয়
উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত শশাঙ্কেশ্বর চৌধুরী পৌরহিত্য করেন

কানপুর ও লাক্কো বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদের ধর্মশাস্ত্রের জন্য বিরক্ত হইয়া দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে
কর্তৃপক্ষই অনিদিষ্ট কালের জন্য শিক্ষায়তন দুইটি বন্ধ করিয়া
দিয়াছেন। ছাত্রদের ইউনিয়নের গঠন তত্ত্ব ও নির্বাহী
লইয়া এই বিরোধের উৎপত্তি হইয়াছে।

বিদ্যালয়ে বনমহোৎসব

ত ২৬শে জুলাই রবিবার বড়চাঁদপুর জি, এস, প্রাঃ
যের প্রাঙ্গণে মাননীয় পঃ বঃ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত
“বনমহোৎসব” অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে
ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহানন্দ হালদার পৌরহিত্য
স্কুলের সম্পাদক শ্রীনিশিকান্ত বৈদ্যের হাত হইতে
“মাতরম” ধ্বনি সহকারে একটি চারা বিদ্যালয়ের
প্রাঙ্গণে রোপন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা ভাষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের বার্ষিক সাধারণ সভায়
একটি প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে যে— বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং
সমিত বিদ্যালয়গুলির সকল শ্রেণীতে যেন বাঙ্গালাভাষাকে
মধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্য অবিলম্বে
প্রণীত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কোর্ট আরও
করিয়াছেন যে বাংলা ভাষার প্রসার কল্পে বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহক পরিষদ যেন একটি বেঙ্গল
মি পঠন করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়

গত ১লা জুলাই হইতে রাজসাহীতে পূর্ববঙ্গের দ্বিতীয়
বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইয়াছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইংরাজী প্রধান অধ্যাপক ডাঃ জুবেরী ইহার ভাইস
চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের উত্তরাঞ্চলের ইন্টার
মিডিয়েট, ইসলামিক, ইন্টারমিডিয়েট এবং কৃষি ও মেডিকেল
কলেজ সমূহের অহুমোদনের ভাৱ এই নূতন বিশ্ব
বিদ্যালয়ের উপর থাকিবে। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার
ব্যবস্থাও করা হইবে।

ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে নূতন ব্যবস্থা

ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপর সরকারী কর্তৃক দৃঢ়তরভাবে
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পূর্ববঙ্গ সরকার একটি নূতন অভিনাশ
কারী করিয়াছেন। তদনুসারে এখন হইতে ভাইস চ্যান্সেলার
নিয়োগের ভার বিশ্ব বিদ্যালয়ের কার্যকারী পরিষদের হাত
হইতে পূর্ববঙ্গের পূর্ববঙ্গ বা চ্যান্সেলারের হাতে অপিত
হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ রাজনীতিতে
কোনও সক্রিয় অংশ এখন হইতে গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(মাসপঞ্জীর শেখাংশ)

মাসের শিক্ষাসংবাদে বর্ণিত হারে ভাড়া আদায়
রাখিতে বলিয়াছেন।

শে—অদ্য কালীঘাট পার্কে হাম-বাস ভাড়াবৃদ্ধি
ধর্ম কমিটির উদ্যোগে ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া
হয়।

শে জুলাই—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার মহেশভলা
উপনির্বাচনে বামপন্থী দল সমর্থিত প্রার্থী শ্রীমধীরচন্দ্র
(কমুনিষ্ট) কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীনীহারেন্দ্র দত্ত
কে পরাজিত করিয়াছেন।

শে জুলাই—কলিকাতার উন্নত পুলিশ বাহিনী অদ্য
কর্তব্যরত ২৫ জন সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের
পরেয়া আক্রমণ চালায়। ফলে কয়েকজন
হয় অর্থ, ঘড়ি, কলম ইত্যাদিও লুণ্ঠিত হয়।

জুলাই—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ডালহৌসী
কুল ব্যতীত কলিকাতা ও উপকণ্ঠস্থ ২৪ পরগণার
সকল লুণ্ঠিত হইতে ১৪৪ ধারার আদেশ প্রত্যাহার।

ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সঙ্ঘের অধিবেশনে : কর্তব্যরত
সাংবাদিকদের উপর পুলিশী আক্রমণের প্রতিবাদ স্বরূপ
অদ্য হইতে এক সপ্তাহ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন
প্রেস নোট ও ইস্তাহার প্রকাশ করা হইবে না।

২৪শে জুলাই—কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহের স্বাধি-
কারী ও সম্পাদকসমূহের এক সভায় পুলিশী আক্রমণের
প্রতিবাদে ২৮শে জুলাই কলিকাতার ২৩টি দৈনিক পত্রিকার
প্রকাশ বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৫শে জুলাই—করাচীতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী
শ্রীজহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ
আলীর মধ্যে তিন দিনব্যাপী বৈঠক আরম্ভ হয়। পণ্ডিত
লক্ষীকান্ত মৈত্র অদ্য কুশনগরে ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক-
গমন করেন।

২৭শে জুলাই—অদ্য পানমুনজনে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও কমুনিষ্টদের
মধ্যে কোরিয়ার মুক্তবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মেডুশত
মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে সংগ্রামের অবসান ঘটে।

হাঙ্গ-পঞ্জী

২৩শে জুন—শেষ রাজি ৩-৪০ মিনিটে শ্রীনগরে বন্দিশালায় ভারতের অন্ততম রাষ্ট্রনায়ক ডাঃ শ্রামাশ্রমাদ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে অন্য সমগ্র ভারত বিবাদময়।

২৪শে—দেপবরণ্য জন-নায়ক ডাঃ শ্রামাশ্রমাদ মুখোপাধ্যায়ের শেষকৃত্য অন্য অপরাহ্নে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে লক্ষ লক্ষ শোকাবুল দেশবাসীর উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন। অন্য অন্যভারত বিজয়ী শ্রীতেনজিংয়ের কলিকাতায় আগমন।

২৫শে—এভারেস্ট বিজয়ী শ্রীতেনজিংকে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বিপুল নাগরিক সম্মাননা প্রদান করা হয়।

২৬শে—অন্য অপরাহ্নে সেনেট হলে এক বিশাল জন-সভায় ডাঃ শ্রামাশ্রমাদ মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি রূপে বাজাপাল স্বয়ং প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

১লা জুলাই—অন্য কলিকাতা ও হাওড়ার ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাব কার্যকরী হইলে যাত্রী-সাধারণ বর্ষিত হারে ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন। অন্য হইতে যাত্রীবাহী যানবাহনে ধুমপান আইন বলবৎ হয়।

৩রা—ট্রামভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে পুলিশ কলিকাতা ও হাওড়ায় সাত-সাতাধিক ব্যক্তিকে অন্য গ্রেপ্তার করে।

৬ই—বর্দ্ধমান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে—দামোদর নদে বস্ত্রের জল দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে।

ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ১৫০ জন লোক ধৃত হয়।

৭ই—জম্মু প্রজাপরিষদের সভাপতি পণ্ডিত প্রেমনাথ জোগরা আজ ঘোষণা করেন যে, জম্মুতে প্রজাপরিষদের আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইল।

বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্য শ্রীকালী মুখার্জী এবং পুরের শ্রীছোটেলাল ব্যাস ও শ্রীরামস্বরূপ সিংহের আশানসোল মহকুমা হইতে বহিষ্কারের সরকারী নির্দেশ।

৮ই—অন্য মাদ্রাজে ১৯৫০ সালের অন্ধ্র রাজ্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ১লা অক্টোবর হইতে রাজ্য গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৯ই—ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পানপোর্ট সম্পর্কে গত ফেব্রুয়ারী-মাসে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়া উভয় দেশের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

১০ই—শ্রী নেহরু পরলোকগত ডাঃ শ্রামাশ্রমাদ মুখোপাধ্যায়ের মাতা, যোগমায়া দেবীকে জানাই—ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ব্যাপারে রহস্যজনক নাই, তাঁহার সম্পর্কে সর্বপ্রকার ধ্বংস লওয়া হইয়াছিল।

ভারত সরকার বস্ত্র ও মৃত্যুর মূল্য এবং বণ্টন সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিয়াছেন।

১১ই—ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিরোধে এবং আতঙ্কিতকারীদের উপর পুলিশের নিপীড়নের প্রতিবাদে ট্রাম ভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে অন্য নিমিত্ত প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

১৫ই—ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধে সমগ্র পুলিশ সাধারণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। কলিকাতা এই দিন ৭৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া জানা। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ১৬ই জুলাই কলিকাতা ও সহরতলীতে ১৪৪ ধারা জারী করেন।

১৬ই—পঃ বঃ সরকার অন্য কলিকাতায় সেনাবাহিনী সাহায্য তলব করেন। এই দিন পুলিশ প্রধান অফিসার, নেবুতলায় এবং ওয়েলিংটন স্কয়ারে জনসমাবেশ লক্ষ্য করিয়া চার বার ২৪টি গুলী

১৭ই—অন্য কলিকাতার অবস্থার আরও অবনতি এবং এই দিনও পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলী ফলে প্রায় দশজন আহত হয়।

১৮ই—ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রথমটি মীমাংসার টাইম্যান্সে প্রেরণের অন্ত পঃ বঃ সরকার ট্রামওয়েজ কোম্পানিকে পরামর্শ দিয়াছেন (শেষাংশ)

কপা হস্তার
হস্তারাগ

কপের কলিকে সৌন্দর্য কৃষ্ণমে বিকশিত করে
তোলাই এই প্রসাধনীর সাধনা। কপ সাধক
সাধিকাদের নিকট তাই ইহা চিরকাম্য সৌন্দর্যের
স্বরম্য সম্ভার।

কালকেমিকোর

মার্গো সোপ
নিম টুথ পেপ্ট

ডুঙ্গল সুবাসিত মহাত্মসরাজ
কেশ তিল

লারনি স্নো ও ক্রীম

কাস্তা মনোমদ গন্ধসার



দিকালকাটা কেমিকাল কোং লিঃ

কালিকাটা ২৩

দি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ২, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

অনুমোদিত মূলধন
আদায়ীকৃত মূলধন
সংগৃহীত মূলধন
সংরক্ষিত তহবিল

৮ কোটি টাকা
৪ কোটি টাকা
২ কোটি টাকা
৭৫ লক্ষ টাকা

চেয়ারম্যান
জি, ডি, বিরলা
ভাইস-চেয়ারম্যান

আর. জি, সরাইয়া

আই, পি, গোরেক্সা

ডিরেক্টরগণ

এম, এল, দাহাহকর
নবীনচন্দ্র মাক্সলাল
এম, আর, কইয়া
এম, এল, তাপুরিয়া
এম, এল, সাহ

পি, ডি, হিম্মৎসিংকা
এ, সি, লাহা
বি, এন, জালান
আর, এল, নোপানি
জি, এল, বাবুর

জেনারেল ম্যানেজার

বি, টি, ঠাকুর

শাখাসমূহ

ভারতবর্ষ :

শিল্প ও বাণিজ্য-প্রধান সকল প্রধান
নগরে।

পাকিস্তান :

চট্টগ্রাম, করাচী,

বম্বাই :

বেঙ্গল, মোলমেন, আকিয়াব, মাম্বাল

মালয় :

সিঙ্গাপুর, পিনাং,

যুক্তরাজ্য :

লন্ডন

অন্তর্জাতিক বিশেষ শাখা :

পন্ডিচেরী, হংকং,

এজেন্ট

পৃথিবীর সর্বত্র—ইয়ুরোপ, আমেরিকা
আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া,

বিভিন্ন প্রকার কাজ

এই ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ করে, অনুমোদিত সিকিউরিটির বিনিময়ে ঋণ দেয়, বিল খরিদ
করে, ড্রাফট ও টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার বিক্রয় করে, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত প্রকৃতির কাজ
করে। এক কথায় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইহার শাখা প্রশাখার মাধ্যমে ব্যাঙ্কবিষয়ক যাবতীয় কাজকর্ম
এই ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে।

বিনামূল্যে 'শিক্ষক' পত্রিকা

শিক্ষক বন্ধুগণের সুবর্ণ সুযোগ

অর্থাভাবে বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে তাহাদের নিজস্ব এই
শিক্ষক পত্রিকা লইতে পারেন না। নিম্নের নিয়মানুযায়ী
তাহারা বিনামূল্যে 'শিক্ষক' পত্রিকা পাইবেন :-

১। শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের ৩ খানা বই পাঠ্য করিলে এবং
এককালীতে বা বিভিন্ন দফায় ৪০০ টাকার বই লইয়া ক্যাসমেন্ডোগুলি
পাঠাইলে ৩ মাসের জন্য।

২। ৬ খানি বই পাঠ্য করিলে এবং ঐ ভাবে ৬০০ টাকার বই কিনিলে
৬ মাসের জন্য।

৩। ৮ খানি বই পাঠ্য করিলে এবং ঐ ভাবে ৮০০ টাকার বই কিনিলে
১ বছরের জন্য।

বলা বাহুল্য উক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়া বইয়ের কমিশনের হার কাহারও কমিবে না।

শিক্ষক পাবলিশিং হাউস

৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১২

N. B. — অন্তর শিক্ষক পাবলিশিং হাউসের বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখুন।

হোমিওপ্যাথির চরম উৎকর্ষ—ডাঃ শীলের অভিনব গবেষণা

১। শক্তিকৃত হোমিও ঔষধ গতিশীল অণুতে (long) বর্তমান থাকে এবং মানব দেহে বৈজ্যতিক শক্তিতে
মণ্ডলীতে তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহার ক্রিয়া নষ্ট হয় না; কিন্তু সঠিক
ব্যতীত অল্প ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাহাদের কোনই ক্রিয়া দেখা যায় না।

২। শক্তিকৃত হোমিও ঔষধ অতিশয় সাক্ষ্যের সহিত সংমিশ্রণে প্রয়োগ করিতে পারা যায় এবং আন্ত
লের জন্য নির্ভর করা যায়।

৩। প্রয়োজন হইলে হোমিও চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় রোগ আরোগ্যের সহায়তার
অথবা রোগীর দুর্বিসহ যন্ত্রণা লাঘব বা আকস্মিক জীবনাশকা দূর করণার্থে মূল ঔষধ স্থূল মাত্রায় (Physiological
dose) প্রয়োগ করা বাইতে পারে।

বাহির হইয়াছে—ডাঃ শীলের

“হোমিও ইন্জেকসন ও স্পেসিফিক চিকিৎসা”

বাংলা (দ্বিতীয় সংস্করণ) পরিবর্তিত ও পদ্বিবদ্ধিত আকারে, দাম ৩/- মাত্র, ডাকমাণ্ডুল স্বতন্ত্র।

এই গবেষণা হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছে। ঔষধের সহজতর নির্বাচন ও চিকিৎসায়
নিকটম সাফল্যই ইহার বিশেষত্ব। এই প্রণালীতে দুর্বিসহ যন্ত্রণার দ্রুত উপশম এবং অধিক সংখ্যক রোগারোগা
চিকিৎসকের সুনাম অর্জনে বিশেষ সহায়ক। ফাইলেরিয়া, সায়েটিকা, বাত, ডিওডেনাল আলসার, প্রীহা ও যকৃত বৃদ্ধি
ভুক্তি বহু পুরাতন জটিল রোগের চিকিৎসা ধুবই। সহজ ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, এই
চিকিৎসা প্রণালী রোগীর পক্ষে ভগবানের দান এবং চিকিৎসকের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। ডাঃ শীলের “হোমিও ইন্জেকসন
স্পেসিফিক চিকিৎসা” নামক পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে। নিয়ে জ্ঞাতব্য—

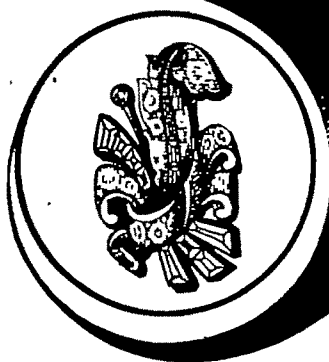
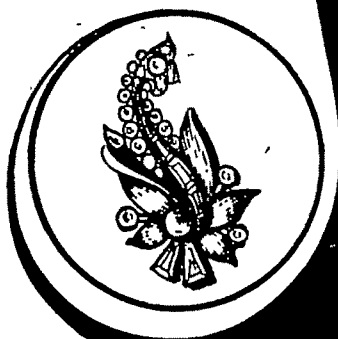
হোমিও রিসার্চ এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস

৬৬১ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ট্রীট, কলিকাতা—২৫

অলঙ্কার

ইবলিষ্টি

MENDED-2003



এম.বি.সরকার এণ্ড সন্স

ফোন-এডিনিউ.১৭৬১
গ্রাম-টিলিয়াবেস,

প্ৰধানত চৰ্মনিৰ্মিতৰ অলঙ্কার দীক্ষাতা ও ইলেকট্ৰনিক্স
১৬৭সি, ১৬৭সি/১ বহুতাজার স্ট্রীট কলিকাতা (আমহার্ট স্ট্রীট ও
বহুতাজার স্ট্রীটের সংযোগস্থল) আমাদেৰ পুৰাতন সোত্ৰমেৰে বৈগৰীত দিলে

ব্রাঞ্চ-হিন্দুস্থান স্ট্রীট বালিগঞ্জ: ১৬৯/১বি, বাসবিহারী এডিনিউ
কলিকাতা : ফোন পি.কে. ৪৪৬৬